বিবেক যোগ

বিবেক যোগ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সিউড়ী কর্ত্তৃক সংকলিত।

প্রকাশক –স্বামী বিবিদিষানন্দ।
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সিউড়ী, বীরভূম।

প্রথম সংস্করণ ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৬৩
বিবেক সপ্তমী।

প্রাপ্তিস্থান:
শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন,
বরাহনগর, কলিকাতা।
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সিউড়ী, বীরভূম।
ন্যাশানাল পাবলিশিং হাউস
এ-৬৮ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

মূল্য: দুই টাকা ~~পঞ্চাশ নয়া পয়সা~~

মুদ্রাকর:
শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়
বীরভূম প্রেস, সিউড়ী, বীরভূম।

ভূমিকা

স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী মহামহোৎসবে আশ্রমের মায়েরা, স্বামিপাদের—ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, বিষয়ে তাঁর অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারের মহার্ঘ রত্নরাজি সমন্বিত পুস্তক চতুষ্টয়ের সারমর্ম একত্র ক'রে অত্যন্ত মধুর, প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় "বিবেক যোগ' নাম দিয়ে এই পুস্তকটিতে প্রকাশিত ক'রেছেন। আমাদের মনে হয়, স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকীতে এটী যেন শ্রেষ্ঠ পূজা। কারণ মহাপুরুষের পূজায় তাঁর যেটি জীবন বেদ—সেটির উপর অন্তরের অনুরাগ-আলো দিয়ে এবং সর্বজনের বোধগম্য ক'রে সেটি প্রকাশ করবার মহতী চেষ্টা কি তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজা নয়?

স্বামিজী নিজ মুখে বলেছেন—কর্ম, ভক্তি, ধ্যান ও জ্ঞান এই চারিটি উপায়ই, এই চারিটি যোগই মুখ্য। আর সব গৌণ। কাজেই এই চারিটি পথের অত্যুজ্জ্বল আলোক-বর্ত্তিকা স্বরূপ তাঁর যোগ-বেদ-চতুষ্টয় হ'তে সার নির্য্যাস সঙ্কলন ক'রে আশ্রমের সন্ন্যাসিনী মায়েরা জনসাধারণের একটি বহু দিনের অভাব মোচন ক'রেছেন।

তাঁর রাজযোগ গ্রন্থের প্রথম প্রস্তাবনায় স্বামিপাদ বলেছেন—"আত্মা মাত্রই অব্যক্ত ব্রহ্ম।" বাহ্য ও অন্তর প্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। কর্ম (কর্মযোগ) উপাসনা (ভক্তিযোগ) মনঃ সংযোগ (রাজযোগ) অথবা জ্ঞান (জ্ঞানযোগ) ইহার মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায়গুলির দ্বারা আপনার ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও। ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। মত, অনুষ্ঠান, পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ উহার গৌণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাত্র।"

তবে সাক্ষাৎ শঙ্কর-স্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র অন্তরটি প্রেম-ভক্তিপূর্ণ। ঐটিই তাঁর আসল পরিচয়। তাই গ্রন্থের প্রথমেই "ভক্তিযোগ।" "ঠাকুরের

বাইরেট ভক্তের মত—এক পা হাঁটতে পারেন না, একটি পা হেথায় পড়ে তো আর একটি হোথায় পড়ে, হাতে ধ'রে ধ'রে নিয়ে যেতে হয়। ভিতরে তিনি তারও পারে, চৈতন্য-স্বরূপ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ এবং আরো কত কি।"

কিন্তু স্বামিজী চিৎ-ভাস্বর ভক্তি-প্রেম প্রতিষ্ঠা। তাঁরই কথা—"তোমরা কি জানো, মানুষের প্রাণ যখন ভক্তিতে ভরে ওঠে, তখন তার হৃদয় ও স্নায়ু সকল এত নরম হয় যে তাতে ফুলের ঘা পর্য্যন্ত সহ্য হয় না? তোমরা কি জানো যে, আজকাল আমি উপন্যাসের প্রেম কাহিনী পর্য্যন্ত পড়তে পারি না? ঠাকুরের কথা খানিকক্ষণ বলতে বা ভাবতে গেলেই ভাবোদ্বেল না হয়ে পারি না? সেইজন্যই কেবলই এই ভক্তি স্রোতটা চেপে যাবার চেষ্টা করি আর জ্ঞানের শিকল দিয়ে নিজেকে বাঁধতে চাই।" স্বামিজীর জীবনের মূল ও বাদী সুর, প্রেম-ভক্তি। এই সুরেই তিনি তাঁর জ্ঞান কর্ম ভক্তি ও রাজযোগ বীণার তারগুলি বেঁধে দিয়েছেন।

আবার এই গ্রন্থের রচয়িত্রীগণও বিবেক-যোগ-রত্নের এক নূতন মূল্যায়ণ ক'রেছেন। তার একটি উদাহরণ ভক্তিযোগে, স্বামিজীর "প্রেম ত্রিকোণাত্মক" শীর্ষক রচনামৃতের বিজ্ঞান সম্মত ও গণিত সম্মত এঁদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাটি। বর্ত্তমান যুক্তি ও বিজ্ঞান-বাদের দিনে জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই এইরূপ বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যায় জনগণের প্রভূত কল্যাণ হয়। তাই স্বামী বিবেকানন্দের শুভ-শতবার্ষিকী পূজায় শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে প্রার্থনা এই সুরভি-সুন্দর পূজা পুষ্পটি যেন অদ্যকার প্রত্যেকটি পূজা মণ্ডপে নিবেদিত হয় ও নিত্য স্বাধ্যায়ের ভাগবত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।

সন্ন্যাসিনী আশাপুরী
(শ্রীআশালতা সিংহ)

বিবেক যোগ

ভক্তিযোগ

ভক্তির লক্ষণ

মন মুখ এক ক'রে ঈশ্বরের অনুসন্ধানই স্বামিপাদের মতে ভক্তিযোগ। নারদীয় ভক্তিসূত্রে আছে, ভগবানে পরম প্রেমই ভক্তি। কোন কাম্য বস্তুর লাভ ভক্তির উদ্দেশ্য নয়, কারণ বিষয় বাসনা থাকলে প্রেম হয় না। ভক্তিই ভক্তির সাধ্য। ইহার আদিতে, মধ্যে ও অন্তে র'য়েছে প্রীতি। জ্ঞান ও ভক্তির লক্ষ্য একই। জ্ঞান ও ভক্তি বস্তুত পৃথক নয়।

ভক্তিযোগ ভগবৎ লাভের সহজ ও স্বাভাবিক সাধন। যতক্ষণ নিম্নস্তরে গৌণী-ভক্তি নিয়ে আমরা থাকি ততক্ষণ গোঁড়ামিতে আমাদের বিচার শক্তি যায় হারিয়ে। তবে ভক্তির পরিপাকে পরাভক্তি লাভ হ'লে আমরা প্রেম-স্বরূপ ভগবানের এত কাছে গিয়ে পড়ি যে, অন্যের প্রতি ঘৃণা করা চলে না।

জ্ঞান, ভক্তি আর যোগ তিনটি যেন পাখীর দুই পক্ষ ও পুচ্ছ। এদের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার আমাদের শ্রেষ্ঠ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করে। তবে যাঁরা শুধু ভক্তি পথ ধ'রে চলেন তাঁদের মনে রাখা উচিত যে সব অনুষ্ঠানই ভক্তির প্রথম পদক্ষেপ। এরা শ্রীভগবানের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমের সহায় মাত্র।

জ্ঞানীরা ভক্তিকে মুক্তির উপায় বিশেষ বলেন, কিন্তু ভক্তের মতে উহা উপায় ও উপেয় দুই-ই। পূর্ণ ভক্তিতে প্রকৃত জ্ঞান অযাচিত ভাবেই এসে পড়ে। অবিচ্ছেদে ভগবৎ স্মৃতিকেই আচার্য্য শঙ্কর ভক্তি ব'লেছেন। ভগবান রামানুজ ব'লেছেন পাত্রান্তরে নিক্ষিপ্ত তৈলধারার মত অবিচ্ছিন্ন যে প্রবাহ তারই মত নিরন্তর স্মরণেরই নাম ধ্যান—ইহাতেই সর্ব্ব বন্ধনের হয় ক্ষয়।

উপনিষৎ ব'লেছেন—পর ও অবর (দূর ও সন্নিকট) পুরুষকে দেখিলে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, সংশয় ছিন্ন হয়, আর সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হয়। সন্নিকটের দর্শন সম্ভব কিন্তু দূরবর্ত্তীকে স্মরণ মাত্র করা চলে। কাজেই স্মরণও একার্থক হয় যখন স্মৃতি প্রগাঢ় হয়। উপনিষদে আরো আছে আত্মা যাহাকে বরণ করেন তিনিই 'ইঁহাকে' লাভ করেন। ইনি তাহার কাছে নিজ রূপ প্রকাশ করেন। অত্যন্ত প্রিয়কেই বরণ সম্ভব। যিনি আত্মাকে অত্যন্ত ভালবাসেন আত্মা তাঁরই প্রতি প্রীতিযুক্ত হন। গীতায় ভগবান স্বয়ং ব'লেছেন—মচ্চিত্ত মদ্গতদের মধ্যে যারা সতত যুক্ত হয়ে প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করে আমি তাদের বুদ্ধি যোগ দিয়ে থাকি যার দ্বারা তারা আমায় লাভ করে। তাই নিরন্তর সাধনাই ভক্তি। পতঞ্জলির ঈশ্বর-প্রণিধান সূত্রের ভোজ ভাষ্যে আছে, প্রণিধান অর্থে সেই ভক্তি-বিশেষ যাতে কোন বিষয় সুখের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। কর্ম্মফল বিরহিত কর্ম্ম ভগবানে অর্পিত হয়। ব্যাস ভাষ্যে আছে—ভক্তি বিশেষই প্রণিধান। আর ইহাতে ভগবৎ কৃপা আবির্ভূত হয় ও বাসনা সম্পূরণ হয়। শাণ্ডিল্য মতে ঈশ্বরে পরমানুরক্তিই ভক্তি। তবে প্রহ্লাদের ভক্তি সংজ্ঞাই সার্থক মনে হয়—অবিবেকীগণের বিষয়ে

যে প্রীতি তোমার স্মরণে সেইরূপ প্রীতি যেন আমার হৃদয় থেকে অপসৃত না হয়। এই আসক্তি ভগবানের জন্যই, অন্যের জন্য হ'তে পারে না। শ্রীভাষ্যে রামানুজ আচার্য্যেরও এই মত। স্বপ্নেশ্বর শ্রীভাষ্যের এই স্থানের ব্যাখ্যায় বলেন, ভগবানের স্বরূপ ও মহিমা জানার পর তাঁর প্রতি যে আসক্তি তাই অনুরক্তি। সাধারণ পূজা পাঠাদি থেকে আরম্ভ ক'রে ঈশ্বরে প্রগাঢ় অনুরাগাত্মক চেষ্টার নাম ভক্তি।

শ্রীঠাকুরের বাণী—ভক্তি মানে কি, কায়মনবাক্যে তাঁর ভজনা করা। তিনি আরো ব'লেছেন, শুধু নাম ক'রলে কি হবে, অনুরাগ চাই। স্বামিপাদের পূর্ব্বোক্ত বাণীগুলি শ্রীঠাকুরের এই বাণীরই ভাষ্য মাত্র।

ঈশ্বর

ঈশ্বর সম্বন্ধে স্বামিপাদ বলেন, তিনি জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের কারণ। তিনি অনন্ত, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত, সর্ব্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, পরম কারুণিক, গুরুর গুরু। আরো, তিনি অনির্ব্বচনীয় প্রেমস্বরূপ। ঈশ্বর পূর্ণ সত্যস্বরূপের উচ্চতম প্রকাশ—আর মানব মনের উচ্চতম উপলব্ধি। বেদান্তসূত্রে ব্যাস বলেন, সৃষ্টি, স্থিতি, আর প্রলয়-শক্তি মুক্তাত্মার জন্য নয়, এ শক্তি শুধু ঈশ্বরের। স্বামিপাদ শাস্ত্রের বাণীগুলি সব উদ্ধৃত ক'রেছেন, যেমন—শ্রুতিতে আছে, আদিতে এক অদ্বিতীয়ই ছিলেন—তিনি আলোচনা ক'রলেন, আমি বহু হব। আদিতে কেবল ব্রহ্মাই ছিলেন, তিনি পরিণত হ'লেন। তিনি পৃথিবীতে অনুস্যূত হ'লেও পৃথিবী হ'তে অতিরিক্ত। আ... [illegible] শঙ্কর বলেন যে, মুক্ত পুরুষগণের ইচ্ছা সেই পরমপুরুষের অধীন। ভক্তিতে

আমরা আমাদের অন্তরের প্রকৃতির সহায়তা নিয়েই এগিয়ে চলি। ব্রহ্মের যে ধারণা সে ধারণা মানবীয় ধারণা ছাড়া আর কিছুই হ'তে পারে না। অন্য সমস্ত ধারণাও এইরূপ মাত্র।

ধর্ম্মে প্রত্যক্ষানুভূতি

ভক্তের এই সব বিচারের প্রয়োজন কি? এই সম্বন্ধে স্বামিজী বলেন—এতে ভক্তের ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করা হয় মাত্র। তবে প্রত্যক্ষানুভূতি ভক্তকে এমন স্থানে নিয়ে যায় যেখানে বিচার বিতর্ক পৌঁছিতে অক্ষম। ভগবৎ বিষয়ের প্রত্যক্ষানুভূতি তাই অন্য বিষয় হ'তে শ্রেষ্ঠ। আর যারা আত্মার উন্নতি ঐহিক সুখ অপেক্ষা ভাল মনে করেন তাদের কাছে ভগবৎ প্রেমই একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু বলেই মনে হয়। ধর্ম্মের রূপক ও পৌরাণিক ভাগ সহজ ভাবেই এসে প'ড়ছে, ধর্ম্মের ইতিহাসে। বড় বড় ধর্ম্মবীরগণ এই সব ধর্ম্মবাদের ছত্র-ছায়ায় জন্মেছেন ব'লেই ইতিহাস স্বাক্ষর দেয়। এগুলি ধর্ম্ম-মনের অবলম্বন-স্বরূপ। এগুলি ছাড়লে ধর্ম্মে ভোগবাদ ও জড়বাদ এসে পড়ে।

গুরু

আচার্য্য বিবেকানন্দের মতে সিদ্ধ হওয়া বা পূর্ণতা লাভ করার অধিকার নিয়েই আমরা জন্মেছি। আমাদের বর্ত্তমান, অতীতের কর্ম্ম ও চিন্তার ফল। কিন্তু এই নিজেদের অদৃষ্ট, আমরা নিজেরাই গঠন করি না। অন্য আত্মার উচ্চতর শক্তির সহায়তায় আধ্যাত্মিক শক্তি সতেজ হ'য়ে উঠে ও তাহার পরিণতিতে আমাদের সিদ্ধাবস্থা লাভ হয়। শ্রীঠাকুর যেমন ব'লেছেন, গুরুর কৃপা হ'লে ভয় নাই।

অন্য এক আত্মার শক্তি হ'তে আত্মায় শক্তি সঞ্চার সম্ভব। যে ব্যক্তিতে শক্তি সঞ্চারিত হয় তার নামই শিষ্য। ধর্ম্মের প্রকৃত বক্তাও আশ্চর্য্য, শ্রোতাও কুশলী হওয়া প্রয়োজন। ধর্ম্মের আলোক আকর্ষণকারী শক্তি যখন পূর্ণ ও প্রবল হয় তখন আলোক-প্রদায়ী শক্তির আসাও নিশ্চিত জানতে হবে। ক্ষণিকের উচ্ছ্বাসকে কিন্তু ধর্ম্ম-পিপাসার পর্য্যায়ে ফেললে চ'লবে না। সত্যকার পিপাসা জাগেনি জানতেই হবে. সত্যগ্রহণের উপযুক্তই হইনি—যদি শক্তি সঞ্চারকারী পুরুষের দেখা না পাওয়া যায়। শ্রীঠাকুরও ব'লেছেন—সময় না হ'লে কিছু হয় না।

অবিদ্যায় আচ্ছন্ন নির্বোধ ও পণ্ডিতম্মন্যমান ব্যক্তিগণ অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় স্খলিত পদে বিচরণ করে। তাহারা গুরু পদবী গ্রহণ ক'রতে পারে না। শ্রীঠাকুর ঢোড়া সাপের ব্যাঙ ধরার কাহিনী এই ক্ষেত্রে বলেছেন।

সৎগুরু ও সৎ শিষ্যের লক্ষণ

জগতের যে সব মহাপুরুষদের হৃদয়ে সত্য সূর্য্যের মত প্রকাশিত হ'য়েছে—তারাই শ্রেষ্ঠ পুরুষ। অধিকাংশ লোকই তাদের ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করে। এই সব লোকগুরু অবতীর্ণ হ'লে আমরা স্বয়ং তাঁর কথা জানতে পারি। সত্য স্বপ্রকাশ। তবে এঁদের কথা ছেড়ে দিলে অন্য নিম্নাধিকারী সম্পর্কে আমাদের কিছু গুণের বিচার প্রয়োজন। শিষ্যেরও কিন্তু সুলক্ষণ থাকা প্রয়োজন। শিষ্য হবে কায়মনোবাক্যে পবিত্র, সত্যকার জ্ঞানপিপাসু আর অধ্যবসায়ী।

স্বামিপাদের মতে গুরু হবেন নিষ্পাপ, শাস্ত্রের প্রকৃত মর্মগ্রাহী আর স্বার্থগন্ধহীন। গুরু শিষ্যে শক্তি সঞ্চার করেন। হৃদয় মনের

পবিত্রতা না হ'লে ভগবদ্দর্শন অসম্ভব। আর ভগবদ্দর্শন যিনি ক'রেছেন তিনি শক্তি সঞ্চার ক'রতে পারেন। গুরুর কার্য্যের প্রেরণা হবে প্রেম। তিনি কোন বিষয়-বুদ্ধিতে অভিভূত না হ'য়ে শুদ্ধ ভগবৎ-প্রীতিতেই শিষ্যকে শুদ্ধ হ'তে আর ভগবৎ তত্ত্ব জানাতে এগিয়ে আসেন। বিবেকচূড়ামণিতে আচার্য্য ব'লেছেন—যিনি বিদ্বান, নিষ্পাপ, কামগন্ধহীন শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ, তিনিই প্রকৃত সদ্‌গুরু। এমন গুরু লাভ হ'লে এবং আমাদের বালকের মত বিশ্বাস ও সরলতায় তাঁর কাছে প্রাণ খুলে দিলে, আমরা সত্য শিব সুন্দরের তত্ত্বগুলি জানতে পারব।

অবতার

সাধারণ গুরু পদবীতে যাঁরা আছেন তাঁদের চেয়ে উচ্চ পদবীতে র'য়েছেন অবতারবর্গ। এঁরা স্পর্শ ক'রে অথবা শুধু ইচ্ছা মাত্রেই অপরের মধ্যে ভগবদ্ভাব সঞ্চারিত ক'রতে সক্ষম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ব'লেছেন—আমাকে আচার্য্য ব'লে জানিও। আমরা মানুষ। মানুষ ছাড়া উচ্চতর কোন কিছু চিন্তাও আমরা ক'রতে পারি না। তাই অবতার তত্ত্বই আমাদের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। আর এই সব মহাপুরুষ আত্মার গভীরতম প্রদেশ থেকে যা অনুভব করেন তাই প্রচার ক'রে থাকেন। এই সহজ দুর্লভ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, ইহাই প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব। এঁরাই আমাদের কাছে ভগবানের মূর্তরূপ, আর এ ছাড়া মানুষ আমরা অন্য কোন ধারণাই ক'রতে সক্ষম নই।

শ্রীঠাকুরের বাণীর সঙ্গে স্বামিপাদের কথার মিল আমরা পাই। 'সাকার মানুষেও তিনি প্রত্যক্ষ। অবতারকে দেখাও যা, ঈশ্বরকে দেখাও তা। তিনি অবতার হ'য়ে জ্ঞান ভক্তি শিক্ষা দেন।'

'ঈশ্বর তত্ত্ব, মানুষে খুঁজবে—যে মানুষে দেখবে উর্জ্জিতা ভক্তি, ঈশ্বরের জন্য পাগল, নিশ্চিত জেনো সেই মানুষে তিনি অবতীর্ণ। অবতারকে সকলে চিন্‌তে পারে না। অবতার যখন আসেন তখন ছু'চার জন অন্তরঙ্গ ছাড়া সাধারণ লোকে জানতে পারে না। অচিনে গাছ দেখেছ—কেউ চেনে না।'

মনুষ্যত্বের ঊর্দ্ধে যাঁরা—আর যারা মনুষ্যত্বের নিম্নস্তরে বর্ত্তমান তারা ছাড়া আর সকলকেই ভগবানের এই মানুষ রূপে অবতীর্ণ অবতারদের পূজা ক'রতেই হবে। গীতায় শ্রীভগবান ব'লেছেন—ধর্ম্মে গ্লানি এসে পড়ে যখন, অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় তখনই। সাধু-গণের রক্ষা ও অসাধুগণের বিনাশের জন্যে আর ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যে আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। অজ্ঞেরা আমার স্বরূপ না বুঝে আমায় অবজ্ঞা করে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব'লেছেন—যখন প্রবল বন্যা আসে তখন ক্ষুদ্র নদী, নালা আপনা আপনি পরিপূর্ণ হ'য়ে যায়। তেমনি যখন অবতারদের শুভাগমন হয় তখন ধর্ম্মের বন্যা নেমে আসে জগতের বুকে, আর আমরা জলে স্থলে আকাশে বাতাসে সর্ব্বত্র ধর্ম্মের পূর্ণ প্রকাশ বোধ করি।

মন্ত্র

অবতারদের দীক্ষাদান ভিন্ন প্রকার। কাজেই তাঁদের কথা ছেড়ে দিয়ে আমরা দেখি সিদ্ধ গুরুগণ মন্ত্রের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জ্ঞান সঞ্চারিত ক'রে থাকেন। এই বিরাট বিশ্ব নাম-রূপাত্মক। প্রকৃতি সর্ব্বত্রই এক নিয়মে বাঁধা। আমাদের ব্যষ্টি চিত্তও তাই নাম-রূপাত্মক। এই চিত্তে প্রথমে চিন্তা তরঙ্গগুলি শব্দ হ'য়ে ফুটে ওঠে, তারপরে তারা স্থূলতর আকার ধারণ করে।

বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও সমষ্টি সত্ত্বা প্রথমে আপনাকে নামে বা শব্দে অভিব্যক্ত করেন, পরে ব্যক্ত জগৎ প্রকাশিত হয় রূপে। জগতের কারণ স্বরূপ এই ব্রহ্মকে স্ফোট বলা হয়। এই স্ফোটের বাচক হচ্ছে ওঁকার। শব্দ আর ভাবের সম্বন্ধ নিত্য। আর ওঁকারই একমাত্র সর্ব্বব্যাপী বাচক শব্দ। স্ফোট সর্বভাবের উপাদান অথচ উহার কোন বিশিষ্ট ভাব নাই। ওঁকারের মধ্যে আমরা দেখি—অ, উ, ম তিনটি অক্ষর আছে। অক্ষরের মধ্যে অ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বৈশিষ্ট্যযুক্ত উচ্চারিত শব্দ। মুখের মধ্যে সমস্ত শব্দ জিহ্বা মূল হ'তে আরম্ভ ক'রে ওষ্ঠে এসে শেষ হয়। কণ্ঠ্য শব্দ হচ্ছে 'অ', আর 'ম' হচ্ছে ওষ্ঠের শেষ শব্দ; 'উ' হচ্ছে যে শক্তি জিহ্বা মূল হ'তে বেরিয়ে এসে ওষ্ঠ পর্য্যন্ত পৌঁছায় তার প্রতীক। ওঁকারে সমস্ত শব্দ উচ্চারণের ব্যাপারটি যেন নিহিত মনে হয়। তাই ওঁকার স্ফোটকে প্রকাশিত করবার উপযুক্ত একমাত্র শব্দ। বাচ্য ও বাচক একই বস্তু, তাই ওঁ ও স্ফোট একই। এই স্ফোট ব্যক্ত জগতের সূক্ষ্মাংশ, ঈশ্বরীয় জ্ঞানের প্রথম প্রকাশক। তাই ওঁকারে ঈশ্বরের প্রকৃত বাচক শব্দ। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ যেমন বিভিন্ন গুণাবলীরূপে সাধকের মনে প্রকাশিত হয় তেমনি তাদের নাম প্রতীকও প্রকাশিত হয় সাধকের গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি হ'তে। ওঁকার যেমন অখণ্ড ব্রহ্মের প্রতীক, এই সব মন্ত্রও তেমনি খণ্ডরূপে প্রতিভাত সেই অখণ্ডেরই প্রতীক। এরা ঈশ্বর প্রণিধানের ও সত্যকার জ্ঞানের সহায়ক।

প্রতীক ও প্রতিমা

স্বামিপাদের মতে প্রতীক বস্তু ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে উপাসনার যোগ্য। স্বামিজী, আচার্য্য শঙ্করের মত উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়েছেন—

মনকে ব্রহ্ম জ্ঞানে উপাসনা ক'রবে। এই উপাসনা ব্রহ্মের উপাসনার কতকাংশে তুল্য উপাসনা। শ্রুতির প্রতীকোপসনার মত পুরাণে ও তন্ত্রে এই উপাসনার কথা আছে, যথা—পিতৃ ও দেবতাদের উপাসনা।

বিবেকস্বামীর মতে ঈশ্বরের উপাসনাতেই ভক্তি ও মুক্তি লাভ হয়। এজন্য দেবতার উপাসনায় স্বর্গ প্রভৃতি বিশেষ ফল লাভ সম্ভব। কিন্তু যেখানে প্রতীককে জগৎ কারণরূপে দেখা হয় সেখানে এই উপাসনা ব্রহ্মের উপাসনার সমান মনে করা যেতে পারে। প্রতিমার সম্বন্ধেও স্বামীপাদের এই মত। আর প্রবর্ত্তকদের পক্ষে ঐ উপাসনা একান্ত প্রয়োজন। শ্রীঠাকুরও ব'লেছেন,—নিরাকারে একেবারে মন স্থির হয় না। মাটি কেন বলছ—চিন্ময়ী প্রতিমা। নানারকমের পূজা তিনি আয়োজন ক'রেছেন অধিকারী ভেদে—যেটি যার ভাল লাগে।

ইষ্ট নিষ্ঠা

স্বামীপাদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কথা তুলে নিষ্ঠার কথা সুরু ক'রেছেন। আত্মার একান্ত অনুরাগ জন্মালে তাঁকে ডাকবার কাল নাই। গভীর প্রেম আর মহান উদারতা একসঙ্গে কদাচিৎ কোন মহাপুরুষের মধ্যে দেখা যায়। অনেকে উদারতার নামে কেবল ভাব পরিবর্ত্তনই করেন, যেন একটা নেশার ঝোঁকের মত। এটি সাময়িক স্নায়বিক উত্তেজনা বিশেষ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন,—সমুদ্রে একপ্রকার ঝিনুক আছে তারা সর্ব্বদা হাঁ ক'রে জলের উপর ভাসে। কিন্তু স্বাতী নক্ষত্রের এক ফোঁটা জল মুখে পড়লে একেবারে ডুবে যায়—আর উপরে আসে না। তেমনি সাধকও গুরুদত্ত মন্ত্র পাওয়া

মাত্র সাধন সাগরে ডুবে যায়, আর অন্য দিকে চায় না। শ্রীঠাকুর চাতকের কথায় ব'লেছেন,—চাতক মেঘের জল ছাড়া আর কিছু খায় না। স্বামীপাদ মহাবীর হনুমানের কথা উদ্ধৃত ক'রেছেন, শ্রীনাথ ও জানকীনাথ অভেদ, তবুও আমার ইষ্ট—শ্রীরাম কমললোচন। তিনি আরও উদ্ধৃত ক'রেছেন.—তুলসীদাসজীর কথা, সকলের সঙ্গে থাকবে, সকলের সঙ্গে আনন্দ ক'রবে, সকলের কথায় সায় দেবে কিন্তু নিজের স্থানে ঠিক থাকবে। শ্রীঠাকুরও গৃহস্থ বধূদের কথায় ব'লেছেন, সকলের সেবা করে কিন্তু প্রাণঢালা ভক্তি একমাত্র স্বামীকেই ক'রে থাকে।

ভক্তির সাধন

বিবেকস্বামী ভক্তির সাধন পথের প্রথম পাদক্ষেপে শ্রীমৎ রামানুজের বেদান্ত ভাষ্যের উল্লেখ ক'রেছেন। এতে আছে—বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, অনবসাদ ও অনুদ্ধর্ষ থেকেই ভক্তি লাভ হয়। বিবেক মানে খাদ্যাখাদ্যের বিচার। এর অশুদ্ধি তিন প্রকার—(১) জাতিদোষ—মাংসাদি। (২) আশ্রয়দোষ—পতিত ব্যক্তির স্পর্শদুষ্ট খাদ্য। (৩) নিমিত্ত দোষ—যেমন কেশাদির সংস্পর্শ। শ্রুতির কথা এখানে স্বামীপাদ উল্লেখ করেন। আহার শুদ্ধ হ'লে চিত্ত শুদ্ধ হয়, শুদ্ধচিত্তে শ্রীভগবানকে স্মরণ করা সম্ভব হয়। আচার্য্য শঙ্করের শুদ্ধি অর্থে আসক্তি, দ্বেষ ও মোহশূন্য হ'য়ে বিষয় গ্রহণ। এতে ব্যক্তির সত্ত্ব অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় শুদ্ধ হয়। তখন তার ব্রহ্ম বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান, স্মৃতি, ধ্রুব হবে।

এ দুটি ব্যাখ্যাই সত্য ও প্রয়োজনীয়। আগে স্থূল সংযম, পরে সূক্ষ্ম সংযম প্রয়োজন। প্রবর্ত্তকের পক্ষে গুরুপরম্পরাগত

আহারের নিয়ম পালন করা উচিত কিন্তু এতে যেন গোঁড়ামী প্রসূত বাড়াবাড়ি না এসে পড়ে।" এই খাদ্যাখাদ্য বিচার মনের স্থিরতার উপায় মাত্র। বিমোক অর্থে ইন্দ্রিয় সকলের বহির্মুখী গতি নিরোধ করা ও নিজের অধীনে আনা। অভ্যাস অর্থে আত্মসংযমের ও আত্মত্যাগের অভ্যাস। গীতার কথা স্বামীপাদ উদ্ধৃত ক'রেছেন এই প্রসঙ্গে; মনের সংযম, অভ্যাস ও বৈরাগ্যে গৃহীত হয়। ক্রিয়ার অর্থ পঞ্চ মহাযজ্ঞের নিয়মিত অনুষ্ঠান। কল্যাণ অর্থে পবিত্রতা। বাহ্যশৌচ ও অন্তর্শৌচ এর দুটী দিক। অন্তর্শৌচের অর্থ—সত্য আর্জ্জব বা সরলতা, দয়া, দান, অহিংসা ও অনভিধ্যা। ঈর্ষার ভাব না থাকলেই যথার্থ অহিংসার প্রতিষ্ঠা হয় আর অনভিধ্যা অর্থে পরদ্রব্যে লোভ, বৃথা চিন্তা ও পরকৃত অনিষ্টাচরণের চিন্তাত্যাগ।

প্রাণহীন আন্তরিকতাহীন আধ্যাত্মিক জীবনের সহায়বিহীন বাহ্যাচারগুলিকে সমূলে ত্যাগ করা ভক্তিযোগের একান্ত প্রয়োজন। অনবসাদ বা বল ভক্তিলাভের একটী সাধন। শ্রুতিতে আছে বল-হীনেরা আত্মাকে লাভ ক'রতে পারে না। এখানে শারীরিক ও মানসিক বলের কথাই বলা হ'য়েছে। শ্রীঠাকুর ব'লতেন, ভক্তির তম যেন ডাকাত-পড়া ভাব। মারো, কাটো, লোটো। ভক্তির তম যার হয় তার জ্বলন্ত বিশ্বাস। দুঃখজনক গভীর ভাবও ভাল নয় আর অত্যন্ত আনন্দও অনুচিত। সব সময় সামঞ্জস্যপূর্ণ ও স্থির থাকলেই আধ্যাত্মিক অনুভূতি আসতে পারে। এর নামই অনুদ্ধর্ষ।

পরাভক্তি ও ত্যাগ

আত্মশুদ্ধিই সকল সাধনের মূল কথা আর এই আত্মশুদ্ধি ত্যাগ ভিন্ন সম্ভব নয়। ত্যাগই প্রকৃত ধর্ম্মের সোপান ও অন্তরঙ্গ

সাধন। এই ত্যাগের মূল কথা বিষয়ে বিরাগ বা বৈরাগ্য। ভক্তি-পথে ত্যাগ, বৈরাগ্য খুব সহজ ও স্বাভাবিক। মানুষ যখন জড় ভাবাপন্ন থাকে তখন ইন্দ্রিয় সুখের তীব্রতা অনুভব করে। আর যতই সে শিক্ষাদিতে উন্নত হয় ততই তার বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম বিষয়ে সুখানুভূতি বাড়ে। আর বুদ্ধির বা মনোবৃত্তির অতীত ভূমিতে যখন উঠতে পারে তখন সে এমন এক আধ্যাত্মিকতার আস্বাদ পায়, এমন্ আনন্দের আস্বাদ পায়, যে তার তুলনায় ইন্দ্রিয় সুখ শূন্য মনে হয়। এই ঈশ্বর ভক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হ'য়ে পরাভক্তিতে পরিণত হয়। তখন বাহ্য অনুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকে না, সীমাবদ্ধ ভাব বা বন্ধন আপনি খ'সে পড়ে। তখন শাস্ত্রের প্রয়োজন যায় হারিয়ে। শ্রীঠাকুর ব'লেছেন,—শাস্ত্রের প্রয়োজন কতদিন, যতদিন না বস্তু লাভ হয়। যেমন একটি চিঠি এসেছে, রেলপাড় শাড়ী পাঠাবে ইত্যাদি। এই পত্রের প্রয়োজন, যতক্ষণ না জিনিষগুলি তার পাঠান যায়। ভক্ত কোন ভাবকে দমিয়ে রেখে চলে না বরং তাদের মোড় ফিরিয়ে ভগবানের দিকে নিয়ে যায়। শ্রীঠাকুর ব'লেছেন,—আমি যখন যাবে না, থাক্ দাস আমি হ'য়ে।

ভক্তের বৈরাগ্য ও প্রেম

(ভক্তের বৈরাগ্য প্রেম-প্রসূত)

সমস্ত প্রকৃতিতে প্রেমেরই বিকাশ—স্বামিজীর এই মত। প্রেমের বিকৃত রূপে প্রকাশিত হয় জঘন্যতা ও পৈশাচিকতা আর যথার্থ ভাবে পরিচালিত প্রেমে প্রকাশিত হয় যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহৎ।

ভক্তিযোগ আমাদের প্রেমকে যথার্থ বিজ্ঞানময় পথে পরিচালিত করে। ভক্তিযোগের উপদেশ সেই পরম পুরুষের প্রেমে উন্মত্ত হও, তখন সব হীনতা অপসৃত হয়। ভগবান পরম সুন্দর, তাঁরই আলোয় সমস্ত বিশ্ব আলোকিত। জগৎটী তাঁর সৌন্দর্য্যের খণ্ড প্রকাশ মাত্র। এই জগতের সৌন্দর্য্যকে উপেক্ষা ক'রে, সমস্ত আসক্তিকে উপেক্ষা ক'রে আমরা যখন সাক্ষী স্বরূপ থাকতে পারব তখনই অখণ্ড প্রেমস্বরূপ ভগবান প্রকাশিত হবেন আমাদের কাছে। ভগবান যেন একটা মস্ত বড় চুম্বক আর আমরা সকলে চূর্ণ লোহার মত তাঁর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছি। সংসারে যা আমাদের আকর্ষণ করে সে সমস্তই তাঁরই আকর্ষণ। শ্রুতি বলেন,—পতির জন্য পতিকে কেহ ভালবাসে না কিন্তু তার অন্তরস্থ আত্মার জন্যই তাকে ভালোবাসে। নীচতম আসক্তিও তাঁরই প্রকাশের অংশ মাত্র। ভক্ত বোঝেন আমাদের এই আকর্ষণ-প্রসূত সংগ্রামের মূল সেই ভগবান, আর তাই তাঁরা ভগবানের দিকেই যেতে চান। এই বিরাট আসক্তি তাকে অন্য আসক্তি বিষয়ে নিশ্চেষ্ট করে। এই পরাভক্তি লাভ হ'লে ভক্ত ভগবানকে দেখেন সর্বত্র, সর্বত্র তাঁর দর্শন পান। এ ভক্ত সর্পকে বলেন—প্রিয়তমের দূত। সকলে তাঁর কাছে ভাই, এক মায়ের ছেলে। ক্রোধ, ঘৃণা, ঈর্ষার অতীত সত্যকে তখনই যায় পাওয়া।

ভক্তি যোগের সহজতা ও মূল রহস্য

(ভক্তিযোগের স্বাভাবিকতা ও উহার মর্মকথা)

বিবেকস্বামী গীতার দ্বাদশ অধ্যায় উল্লেখ ক'রে ব'লেছেন যে, এই অধ্যায়ে জ্ঞান ও ভক্তিযোগ উভয়েরই কথা বলা হ'য়েছে।

জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই ও অনেকে মনে করেন যে তাহারা এই পথের উপযুক্ত পথিক। কিন্তু জ্ঞানযোগের পথ বড় কঠিন পথ। এ পথের বিপদ অনেক।

মানব সাধারণের দুইটি প্রকৃতি দেখা যায়—আসুরী ও দৈব। আসুরী প্রকৃতির মানুষ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়াসী। আর দৈবী মানুষ যাঁরা, তাঁরা এই দেহকে আত্মার উন্নতির যন্ত্র-স্বরূপ মনে করেন। জ্ঞানমার্গ. সাধু প্রকৃতির সহায়, আবার অসাধুদেরও তেমনি সহায়ক। জ্ঞানের উচ্চ অবস্থা লাভ যেমন সম্ভব তেমনি নিম্নে পতনও সহজ। বিষ্ণুপুরাণের গোপ কন্যার কথা উল্লেখ ক'রে স্বামীপাদ ব'লেছেন—জনৈক গোপবালার ভগবানের চিন্তায় আর তাঁকে না পাওয়ার দুঃখে পুণ্য ও পাপজনিত সমস্ত কর্মফলের নাশ হ'য়েছিল আর তিনি মুক্তি লাভ ক'রেছিলেন। আমাদের মনে যত প্রকার ভাব বা বাসনা আছে সেগুলি কেহই মন্দ নয়। ভক্তিযোগ প্রভাবে সে সব ভাব উচ্চাবস্থা লাভ ক'রে চরমত্ব লাভ করে। উহাদের সর্ব উর্দ্ধগতির লক্ষ্য ভগবান আর নিম্নমার্গে রয়েছে বাসনা সকল। ধীরে ধীরে উহাদের ভগবানে মোড় ফিরিয়ে নিতে হবে। তখনই উহারা ভগবৎ বিষয়ে আনন্দ লাভ করে।

ভক্তির অবস্থা

ভক্তি কত রূপে প্রকাশিত হয় তার উল্লেখে স্বামীপাদ শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রের অবতারণা করেন।

প্রথম শ্রদ্ধা, আর শ্রদ্ধার মূল ভালবাসা। যাকে আমরা ভালবাসি তাকেই আমরা শ্রদ্ধা করি। ভক্তেরা ভগবানের দিকে এই ভালবাসার মোড় ফিরিয়ে দেন। এর নাম প্রীতি। এর পর

প্রেমাস্পদ শ্রীভগবানের অভাবে যে তীব্র মধুর দুঃখ, যে তীব্র অনুভূতি, বিরহ তারই নাম। এই অবস্থায় অন্যের চিন্তা একেবারেই ভাল লাগে না, যাকে বলা হয় ইতর-বিচিকিৎসা। প্রিয় ভগবানের জন্য প্রাণ ধারণ—তার নাম তদর্থপ্রাণসংস্থান। তদীয়তাই ভক্তের চরম অবস্থা। এই অবস্থায় আমি-আমার জ্ঞান থাকে না। বিবেকপাদ এখানে শ্রীমদ্ভাগবতের বহু প্রসিদ্ধ মহাপ্রভু কর্তৃক উদ্ধৃত শ্লোকটির কতকটা বলেছেন। আত্মারাম মুনিরা নির্গ্রন্থ ও উরুক্রমগণ তাঁর প্রতি অহৈতুক ভক্তি করেন, শ্রীহরির এমনি গুণ। প্রেমিকের কাছে প্রেমাস্পদের সমস্তই পবিত্র। সমস্ত জগতকেই সে ভালবাসে, কারণ জগৎ যে শ্রীভগবানেরই।

সার্বজনীন প্রেম ও আত্মনিবেদন

স্বামীপাদ বলেন ঈশ্বর সমস্ত জগতের সমষ্টি মূর্ত্তি। এই সমষ্টিকে এক অখণ্ডরূপে ভালবাসতে না পারলে ব্যষ্টিকে, জগৎকে খণ্ড খণ্ডরূপে ভালবাসা যায় না। ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারলে সমস্ত চরাচরকেও ভালবাসা যায়। ভারতের মনের ইতিহাস সর্বত্রই এক প্রকার, বহুর মধ্যে এক সর্বগত তত্ত্বের সন্ধানে ব্যস্ত। আমরা এক এক ক'রে জগতের লোকদের অনন্ত কাল ধ'রে ভালবেসে সার্বজনীন প্রেম লাভ করতে পারি না। সমস্ত জগৎটাকে একেবারে ভালবাসতে পারি না। কিন্তু যখন আমরা বুঝতে পারি যে ঈশ্বর এই সমস্ত প্রেমের সমষ্টি স্বরূপ তখনই ভক্তের সার্বজনীন প্রেম লাভ সম্ভব।

ভগবৎ প্রেমেই আমরা প্রেমের সার্বজনীনতা লাভ করি। এই প্রেমের উচ্চতর অবস্থায় আমরা সর্বভূতে আমাদের উপাস্যকে

দেখতে পাই। এই অবস্থায় জগতের সমস্ত কিছুর মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রভেদ, তা আর দেখা যায় না। তখন জীবনের সর্বপ্রথম কার্য্য হয় সর্বভূতের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করা। সেই ভক্ত নিজের জন্য কিছু চিন্তা করেন না। প্রভুর চরণে এই আত্মসমর্পণ—মান, যশ, ভোগ-সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে হয়। এই অবস্থায় কোন স্বার্থ থাকে না আর স্বার্থহানিকর বস্তুও থাকে না। তখন কেবল সর্বভূতের অন্তরাত্মা ও আধারভূত ভগবৎ আসক্তিই থাকে। ইহাতেই সর্ব বন্ধনের মুক্তি।

পরাবিদ্যা ও পরাভক্তি

মুণ্ডক উপনিষদে আছে জানবার মত দুইটি বিদ্যা আছে 'পরা' ও 'অপরা'। অপরা বিদ্যার মধ্যে রয়েছে চতুর্বেদ, আয়ুর্বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ ও জ্যোতিষ—আর পরাবিদ্যা ব'লতে বুঝায় ব্রহ্মবিদ্যা। দেবী ভাগবতে আছে,—যেমন তৈল পাত্র হ'তে পাত্রান্তরে ঢ'লবার সময় অবিচ্ছিন্ন ধারে পতিত হয়, তেমনি মন যখন অবিচ্ছেদে ভগবৎ স্মরণ করে তখনই পরাভক্তি উদিত হ'য়েছে বুঝতে হবে। এরই অপর নাম রাগানুগা ভক্তি। এই ভক্তের মন পবিত্রতায় পূর্ণ আর সর্ব-বন্ধন-মুক্ত হ'য়ে শান্ত হ'য়ে যায়। বহ্নি-মুখী পতঙ্গের মত প্রতিদান নিরপেক্ষ দিব্য ভগবৎ প্রেম, কেবল প্রেমের জন্যে প্রেম। এই প্রেম পরাভক্তির পথেরই দেয় দিশা। ভক্তের কাছে এই দুই-ই এক।

প্রেম ত্রিকোণাত্মক

প্রেমকে স্বামিজী মহারাজ একটি ত্রিকোণের সঙ্গে তুলনা ক'রেছেন। প্রেমে কোনরূপ দান প্রতিদানের সম্বন্ধ নাই।

ভিক্ষুকের প্রেম হয় না, এটি দেখাতে স্বামীপাদ একটী সাধু ও নৃপতির কাহিনী ব'লেছেন। সাধু নৃপতির কাছে কিছু প্রতিগ্রহ ক'রতে রাজি হননি কারণ, রাজার নিজেরই বহু প্রার্থনা ছিল। মুক্তির জন্য উপাসনাও অধম। প্রেমের আর একটী কোণ, ভয়-হীনতা। প্রেমে সমস্ত ভয় দূর হয়। নিজ পুত্রকে রক্ষা ক'রতে মা সিংহের মুখে প্রবেশ ক'রতেও ভয় পায় না। আমরা যত স্বার্থপর ও ক্ষুদ্র হই আমাদের ভয়ও ততই বেড়ে ওঠে। প্রেমের সব চেয়ে বড় আদর্শ যে প্রেমিকের প্রেমাস্পদ আর দ্বিতীয় কেউ থাকবে না। আর এই আধার স্বয়ং ভগবান। সব সৌন্দর্য্য, মহত্ত্ব ও শক্তির সমষ্টি ও আদর্শ যে শ্রীভগবান নিজে। আমাদের মনে ঐ সব সৌন্দর্য্য প্রভৃতির আদর্শ কোন না কোনরূপে বর্ত্তমান আছে। আমাদের পূজা আমাদের এই আদর্শেরই পূজা। আর তাদের বাইরে প্রকাশ ক'রতে গিয়েই আমাদের নানাপ্রকার কার্য্যপদ্ধতি। আবার সমাজে যে নানাপ্রকার চেষ্টা দেখি তা-ও এই আদর্শকে রূপায়িত করবার চেষ্টা মাত্র। তবে এই অন্তরের আদর্শ বাইরের সঙ্গে খাপ খেতে পারে না। তাই বাইরের সত্তাকে অন্তরের আদর্শের মত গড়ে তোলবার দুশ্চেষ্টা ত্যাগ ক'রে সেই পূর্ণ আদর্শকেই সত্যিকারের ভালবাসতে হবে।

এখানে স্বামীপাদ ত্রিকোণের কথা আনলেন কেন—এই প্রশ্নে আমরা দেখি যে বিজ্ঞানে couple theorem অনুযায়ী তিন কোণে তিনটি শক্তি ভক্তের থাকে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে স্বার্থহীনতা। দ্বিতীয় কোণে রয়েছে ভয়শূন্যতা। তৃতীয় কোণে আছে এক-মুখীনতা। এই তিনটি শক্তিকে ত্রিভুজের তিনটি বাহুরূপে ধরা হচ্ছে

স্বামিজীর মতে। এই ত্রিভুজের শীর্ষস্থানে র'য়েছেন ভগবান। কাজেই এরা একটি couple বা ঘূর্ণন সৃষ্টি ক'রবে। অর্থাৎ ভগবানকে কেন্দ্র ক'রে লীলা চলবে। সরলরেখায় কোন একটী শক্তিকে (force) প্রকাশ করা তখনই চলে যখন তারা হয় একমুখী বা cyclic. এখানে তিনটি শক্তিই ভগবৎ-মুখী। আবার গণিত বিজ্ঞানে একটি চূড়ান্ত কথা দেওয়া আছে। যখন তিনটি বাহু ক্ষুদ্র হ'তে হ'তে একটি বিন্দুতে মিলিত হয় তখন ত্রিভুজও বিন্দুতে পরিণত হয়; বিন্দুটি শ্রীভগবান। অর্থাৎ ভক্ত ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যায়। ক্ষেত্রফল তখন পূর্ণ। Area of the triangle infinite, momentও infinite অর্থাৎ ব্যবধান শূন্য হ'লে force তখন infinite হয়। $(C = r \times F)$ অর্থাৎ ভগবৎ-মিলনে ভক্তের শক্তি হয় অসীম। তাই ব্যবধান যত কম হবে ভক্তের শক্তিও তত বাড়বে। কিন্তু ত্রিকোণের এই extreme position গণিতের ভাষায় একান্তই singular। তাই ভগবান ভক্ত এক হ'য়ে যায় না। তাই ব্যবধান থেকে যায় বা লীলা থেকে যায়।

Area of the triangleটির দ্বিগুণ হয় তার Moment. এর অর্থ এই যে মানুষের নিজস্ব শক্তির চেয়ে অনেক বেশী হ'য়ে পড়ে ভক্তি সমন্বিত শক্তি।

প্রেমের ঠাকুরের প্রমাণ তিনি নিজেই

ভক্ত যখন বুঝতে পারে যে অন্তরের আদর্শকে বাস্তবে পাওয়া যায় না আর বাইরের সব কিছু তার আদর্শের তুলনায় কিছুই নয় তখন সে তার অন্তরের আদর্শকে ভূমারূপে অথচ বাস্তবরূপে অনুভব করতে পারে। তখন সে আর ভগবানের প্রমাণ চায় না। তার

ভগবান তখন প্রেমের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ, আর এই উপলব্ধিই তার কাছে যথেষ্ট। প্রেম-স্বরূপে তিনি সর্ব্বোচ্চ আদর্শ আর প্রেমাস্পদের কাছে প্রেমিকের কাছে প্রমাণের প্রয়োজন নাই কোনদিনই। প্রেমের গণ্ডিকে ক্ষুদ্র করাই ভুল। যখন আমরা পবিত্র হই আর প্রেমে পূর্ণ হই তখন শ্রীভগবানের অন্য সব ভাব আমাদের কাছে ছেলেমানুষী মনে হয়। তখন ভক্ত দেখে তিনি দেবারামেও আছেন আবার বাইরেও সেই তিনিই। সাধুর মনেও তিনি, আবার অসাধুর বুকেও সেই এক প্রেমের ঠাকুর।

ভগবৎ প্রেমের ভাষা

আমাদের ভাষায় ভগবৎ প্রেমের আদর্শকে প্রকাশ করা অসম্ভব। আমাদের প্রেমের কথা সেই ভগবৎ প্রেমেরই প্রতীক রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সমস্ত জগৎটাও যেন অসীমকে সীমার ভাষায় প্রকাশিত ক'রছে। পরাভক্তির লেখকেরা ভগবৎ প্রেম লৌকিক ভাষায় বুঝাতে, অনুভব করাতে চেয়েছেন। এই ভাবগুলি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শান্ত ভক্তি প্রেমের সকলের চেয়ে নিম্ন অবস্থার কথা। এই অবস্থায় আমরা আত্মহারা হয়ে যাই না। শান্ত ভক্ত ধীর নম্র। দাস্য ভক্ত বিশ্বাসী, দাসের মত ঈশ্বরের প্রতি ব্যবহার করে। সখ্য প্রেমে আমরা ভগবানকে বন্ধুভাবে দেখি। এই অবস্থায় আমরা তাঁকে সমান সমান ভাবে দেখি। তিনি কেন সৃষ্টি ক'রেছেন এর অনেক উপাখ্যান আছে, তবে সেগুলির মূল্য নাই। তিনি পূর্ণ। তাঁর কোন অভাব পূরণের জন্যই সৃষ্টি হয়নি। এটি শুধু তাঁর মজার খেলা মাত্র। আর আমরা যখন সমস্ত ভুলে এই জগৎটাকে খেলা মাত্র মনে করি

তখন সমস্ত দুঃখ চলে যায়—যদি আমরা ভাবি যে আমরা শুধু তাঁর হাতের দাবা বড়ের ছক মাত্র, আমরা তাঁর ক্রীড়ার সহায়মাত্র। এর পরের অবস্থার নাম বাৎসল্য প্রেম। মা বা বাবার ছেলের প্রতি ভক্তি বা ভয় হয় না। ছেলের দাবি শুধু তাদের কাছে পাওয়া। যে সম্প্রদায় ভগবানের অবতারে বিশ্বাস করে তাদের এই মতে সাধন সহজ। খৃষ্টান ও হিন্দু সমাজেই মাত্র এই সাধনার কথা আছে। ভয় ঐশ্বর্য্যের ভাব ডুবিয়ে দিয়ে এই বাৎসল্য প্রেমের কথা সাধক জীবনে বহু ভাগ্যে প্রকাশিত হয়। মধুর ভাব ঐশ্বরিক আদর্শের সর্বোচ্চ প্রকাশ এবং মানবীয় প্রেমে মধুর ভাবই প্রবলতম। এই ভাবে আমরা সকলেই তাঁর কান্তা, তিনি আমাদের সকলের পতি-স্বরূপ। আমরা ক্ষুদ্র আধারের উপর অন্ধভাবে আসক্ত হ'লে অশান্তি ভোগ ক'রতে হবে—আজই হোক কি দু'দিন পরেই হোক। কাজেই যাঁর প্রেমে জোয়ার ভাঁটা নাই সেই প্রেম সমুদ্রে সমস্ত নদীই একদিন প্রবেশ করবেই। ক্ষুদ্র আধারে কি সুখ? অখণ্ড আনন্দের জমাট-বাঁধা-রূপ সেই ভগবানকেই আমাদের পেতে হবে। শ্রীভগবানের অধরামৃতে যিনি কৃতার্থ তার কাছে জগৎ—জগৎ থাকে না। সমস্ত এক প্রেমের অনন্তে যায় হারিয়ে। প্রেমের এই চরম উন্মত্ততা হ'তেও পরকীয়া প্রেম আরও বেগশালী। এখানে বাধাপ্রাপ্ত প্রেম উত্তরোত্তর প্রবল ভাব ধারণ করে। বৃন্দাবন-লীলা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই প্রেমে কামনা থাকে না। কারণ আলো আঁধার এক সঙ্গে থাকা সম্ভব নয়। শ্রীঠাকুর এ ভাবগুলির কথায় ব'লেছেন—তাঁকে লাভ ক'রতে হ'লে একটা ভাব আশ্রয় ক'রতে হয়—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর।

শ্রীঠাকুর সাধন রহস্য বললেন, আর স্বামিজী বললেন, ভক্তেরা শান্তাদি-ভাব বুঝতে চেয়েছেন ও ভাষায় বুঝাতে চেয়েছেন। এতে ঐতিহাসিক মূল্যও দেখান হ'ল। ইতিহাসে প্রথম আসে উপলব্ধি তারপর বুঝতে চাওয়া। এর অর্থ এই যে প্রথমে ভক্তরা শ্রীভগবানকে ডেকে গেছেন নিজের নিজের ভাবে। তারপর তারা সামাজিক মনস্তত্ত্ব দিয়ে, সামাজিক ভাব দিয়ে, এগুলি মিলিয়ে নিতে চেয়েছেন। এই যে সাধন এদের সমাজের ভাষায় কি নাম দেওয়া যায়। ইতিহাসের দৃষ্টিতে প্রথম experience বা অনুভূতি বা সাধন—তারপর তাকে বুঝতে চেষ্টা করা classification, definition ইত্যাদি।

উপসংহার

প্রেম, প্রেমাস্পদ ও প্রেমিক এরা এক। তবে ভক্ত পৃথক হ'য়ে থাকতে ভালবাসে। শ্রীগৌরাঙ্গের কথা স্বামীপাদ তুলে দিয়েছেন,—ভগবান, আমি ধন, জন, সৌন্দর্য্য, বিদ্যা এমন কি মুক্তি পর্য্যন্ত চাই না, জন্মে জন্মে যেন তোমার চরণে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে। ভক্তের কথা চিনি হওয়া ভাল নয় চিনি খেতে ভালবাসি। ভক্ত চান ভগবানকে ভালবাসতে আর চান ভগবানও যেন তাকে ভালবাসেন। এই প্রেমের উন্মত্ততায় মানুষের সংশয় ব্যাধি অনন্ত কালের জন্য মুছে যায়। এই প্রেমের ধর্মে আমাদের দ্বৈতভাবে চলতে হবে। মুক্তি নির্বাণ এসব ভক্তের কাছে তুচ্ছ।

জ্ঞানযোগ

(১)

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সমন্বয়-ধর্ম্মী—তাঁকে এ মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রেছিলেন শ্রীঠাকুর নিজে। এই বৈচিত্র্যময় যুগে যুগ-জিজ্ঞাসার মূর্ত্ত প্রতীককে অভিভূত ক'রতে, তাকে স্বমতে আনতে যেন এমনি একটি মন্ত্রেরই প্রয়োজন ছিল। এই বিশ্বজোড়া ফাঁদেই ধরা পড়েছিল তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব—বিরাট প্রতিভা। তার থেকে মুক্তির কোন গুপ্ত পথই তিনি খুঁজে পাননি। সেই সমন্বয়-দ্রষ্টা ঋষির বিজ্ঞান-ঘন জীবনের এক একটি অধ্যায়ে—প্রতিটি কর্ম্মে, প্রতিটি বাণীতে র'য়ে গেছে একটি অনন্ত সম্ভাবনার নূতন আলো—যাকে ঠিক একটি দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার ক'রলে ভুল হবে। পাশ্চাত্য বিজয়ের মধ্যাহ্নে, যখন জ্ঞান-ভাস্করের মত ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর প্রতিভা, বিচ্ছুরিত সূর্য্য-কণিকার মত—তারই কিছু কিছু গুণগ্রাহী পাশ্চাত্য ভক্তদের প্রচেষ্টায় ধরে রাখা সম্ভব হ'য়েছিল পুঁথির বন্ধনে। তারই একটি জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ জ্ঞানযোগ। কয়েকটি নাতিদীর্ঘ অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থখানি যেন জ্ঞানভিক্ষুর নূতন দিক-দিশা। ব্রহ্মের আবরণী শক্তি, 'মায়া' তত্ত্ব দিয়ে সুরু হ'য়েছে এই গ্রন্থের।

স্বামিজী মায়ার রূপ সংজ্ঞা দিতে ব'ললেন মায়া অর্থে কল্পনা বা কুহক নয় যদিও প্রাক্-ঔপনিষদিক যুগে মায়ার অর্থ কুহক অর্থাৎ ইন্দ্রজালই ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে

মায়ার একটি নবতম স্বতন্ত্র রূপ আমরা দেখি যাকে ঠিক সাধারণ কোন একটি সংজ্ঞার মধ্যে ফেলা যায় না। একটি মহিমময় সংজ্ঞায় তিনি মন্ত্রময়ী, "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্॥" তিনি সেখানে পরমা প্রকৃতি। পরে কতকটা বৌদ্ধদের আইডিয়ালিজমে এবং তার থেকে জগৎ মায়ার একটি অতি সাধারণ ক্ষীণ ধারণা এসেছিল বটে কিন্তু বেদান্তোক্ত মায়ার অর্থ হ'ল, আমরা কি, এবং সর্ব্বত্র কি প্রত্যক্ষ করছি—এই সম্বন্ধে একটি সহজ বর্ণনা। অবশ্য বৈদিক ঋষিগণ মূলতত্ত্ব নিয়েই মগ্ন ছিলেন, তাই মায়া তত্ত্বের বিচারে তাঁরা মাথা ঘামাননি।

প্রথম বাহ্যজগতের অনুশীলন থেকেই তাঁরা জগৎ রহস্যের মূল আবিষ্কার ক'রতে অগ্রসর হ'য়েছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্য সেই অনুশীলনের মধ্যে দেখা যায় আধুনিক বিজ্ঞানের মতবাদ। উপনিষদের আকাশ তত্ত্ব আর বিজ্ঞানের 'ইথার' মনে হয় সমধর্ম্মী। প্রথম জৈব আবির্ভাবের বর্ণনাতেও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের একটি মতের সঙ্গে বৈদিক মতের সৌসাদৃশ্য মেলে। যথা জীব অন্য গ্রহাদি হ'তে পৃথিবীতে সংক্রমিত হয় এবং বৈদিক অনুশীলন বলে, জীব চন্দ্রলোক উপজাত।

স্বামিজী বলেন, দীর্ঘদিনের অনুশীলন ফলে একটা সিদ্ধান্তে বৈদিক দার্শনিক এসে পৌঁছেছিলেন যে আমরা দেশ-কাল-নিমিত্তের বাইরে যেতে পারি না। এবং এই ব্যর্থতাই খুব সম্ভব এই মায়াবাদ—অর্থাৎ দেশকালের বাইরে আমরা কেন যেতে পারছিনা—এই প্রশ্নের মুখোমুখি ক'রে তুলেছে।

এর পরের অনুশীলনে আমরা পাই জগৎ সৎ-অসতের সমষ্টি। এর নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই, কিন্তু আপেক্ষিক অস্তিত্ব আছে (বিশিষ্টা-

দ্বৈতবাদের একটি অস্পষ্ট ছায়া যেন এখানে প্রতিভাত হয়) এবং জগৎ-অস্তিত্বের প্রমাণ করে—ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা যদি বাড়ে তবে জগতের বৈচিত্র্যও যাবে বেড়ে। এই বিরুদ্ধ ভাবের সংমিশ্রনের ফলেই সুখ দুঃখ হাসিকান্নার এই জৈব চক্র আবর্ত্তিত হ'য়ে চলেছে।

স্বামিজী আরও বল্লেন সবেরই লক্ষ্য যদিও মৃত্যু অর্থাৎ একটি সুনিশ্চিত সমাপ্তি একথা সকলেই আমরা জানি তবু যেন কিছুই জানি না, আমাদের এই অজ্ঞতাই মায়া। আমাদের বুদ্ধি, জ্ঞান, জীবন প্রত্যেক ঘটনার মধ্যেও রয়েছে বিরুদ্ধভাব যার ফলে চিরন্তন হ'য়ে আছে জাতিগত পার্থক্য, দেশাচারগত পার্থক্য সুখ দুঃখের অনুভূতিগত পার্থক্য এবং এই বিভেদও মায়া—এর মীমাংসা অসম্ভব এবং এর প্রকৃত স্বরূপ কোনদিনই জানতে পারব না ; এরই হাতে আমরা যন্ত্রবৎ পরিচালিত হচ্ছি। তার প্রমাণ ভাল মন্দ সমস্ত কাজই আমরা করছি কিন্তু কেন করছি বুঝতে পারি না। সংসারের এই গতি, এই সংসার গতির নাম মায়া। কিন্তু আমাদের সাহসী হ'তে হবে এবং মানস রোগের প্রতিকার চাইলে হ'তে হবে নির্ভীক ও আত্মদোষ প্রতিকারী। আশাবাদীর দৃষ্টিতে জগৎ সুন্দর। অবশ্য তার জগৎ সে নিজে, কিন্তু একথা জানা উচিত 'একের সৌভাগ্য অপরের দুর্ভাগ্যকে টেনে আনে। এই দৃষ্টিতে দেখতে গেলে এ জগতে শুধু পশুকুল মানুষের ভক্ষ্য নয়—ক্ষমতার ক্রম অনুসারে মানুষের নিজের মধ্যেও গড়ে ওঠে খাদ্য খাদক সম্বন্ধ। এরও নাম মায়া।

মায়ার প্রসঙ্গে আরও বল্লেন স্বামিজী, একটা কথা আমরা শুনি, চরমে মঙ্গল আছে কিন্তু পশু-ভাবাপন্ন বর্ত্তমানে যে চরম অমঙ্গলের খেলা চলছে তার কিন্তু কোন মীমাংসাই নাই।

ডারউইনের ক্রমবিকাশের আলোচনায় আরও শোনা যায়, মানুষ যত নির্দ্দোষ হ'তে পারবে ততই মঙ্গল আসবে। কিন্তু একজন সর্ব্ব-সম্পদে সম্পদশালী ব্যক্তির কাছে এ কথা যত আরামপ্রদ হোক না, লক্ষ লক্ষ জীবন যন্ত্রণায় কাতর ব্যক্তির কাছে এ কথার কোন মূল্যই নাই এবং এই রকম জীবনের সংখ্যাই বেশী। অথচ এদেরই নিষ্পেষিত ক'রে গ'ড়ে উঠেছে তথাকথিত বিদ্বান, ধনী, সভ্য সমাজ। আরো দীন অরণ্যবাসীর তুলনায় তাদের এতটুকু অমঙ্গলের আভাসও সহ্য হয় না। একজন শত লাঞ্ছনায় কাতর হ'য়ে পড়ে না—আর একজন একটি কথার ঘায়েও আহত হ'য়ে পড়েন।

অতএব বর্ত্তমান ঘটনার অস্তিত্বই মায়া। বিরুদ্ধভাব এই অস্তিত্বের মূল। যেখানে মঙ্গল সেখানেই অমঙ্গল। অতএব বেদান্ত পেসিমিজ্‌ম্‌-অপ্‌টিমিজমের একটা মিশ্র মতবাদ। এই মতে কেবলমাত্র সুখের সংসার হ'তে পারে না, সুখ নিতে হ'লে দুঃখকেও নিতে হবে বরণ ক'রে। এবং এই মঙ্গল এবং অমঙ্গল একই সত্ত্বা, ঘটনার পারম্পর্য্যে আজকের মঙ্গল, এক বিষয়ে সুখ, কাল অমঙ্গল এবং আর বিষয়ে দুঃখের কারণ হ'য়ে ওঠে। কিন্তু একটিকে যদি আমি গ্রহণ না করি তা'হলে অপরটিকেও ত্যাগ ক'রতে হবে। জীবন মৃত্যু সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে একটিকে গ্রহণ ক'রলে যখন আর একটিকে গ্রহণ ক'রতে হবে, তখন বেদান্তাদি শাস্ত্র বা ধর্ম্মের প্রয়োজন কি? কারণ যত পুণ্য-কর্ম্মই করনা কেন, সুখ-দুঃখ সমভাবেই ভোগ ক'রতেই হবে। এর উত্তর দুঃখ মোচনের উদ্দেশ্যে তোমাকে কর্ম্ম ক'রতেই হবে—অবশ্য

দ্বৈতবাদের একটি অস্পষ্ট ছায়া যেন এখানে প্রতিভাত হয়) এবং জগৎ-অস্তিত্বের প্রমাণ করে—ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা যদি বাড়ে তবে জগতের বৈচিত্র্যও যাবে বেড়ে। এই বিরুদ্ধ ভাবের সংমিশ্রনের ফলেই সুখ দুঃখ হাসিকান্নার এই জৈব চক্র আবর্ত্তিত হ'য়ে চলেছে।

স্বামিজী আরও বল্লেন সবেরই লক্ষ্য যদিও মৃত্যু অর্থাৎ একটি সুনিশ্চিত সমাপ্তি একথা সকলেই আমরা জানি তবু যেন কিছুই জানি না, আমাদের এই অজ্ঞতাই মায়া। আমাদের বুদ্ধি, জ্ঞান, জীবন প্রত্যেক ঘটনার মধ্যেও রয়েছে বিরুদ্ধভাব যার ফলে চিরন্তন হ'য়ে আছে জাতিগত পার্থক্য, দেশাচারগত পার্থক্য সুখ দুঃখের অনুভূতিগত পার্থক্য এবং এই বিভেদও মায়া—এর মীমাংসা অসম্ভব এবং এর প্রকৃত স্বরূপ কোনদিনই জানতে পারব না; এরই হাতে আমরা যন্ত্রবৎ পরিচালিত হচ্ছি। তার প্রমাণ ভাল মন্দ সমস্ত কাজই আমরা করছি কিন্তু কেন করছি বুঝতে পারি না। সংসারের এই গতি, এই সংসার গতির নাম মায়া। কিন্তু আমাদের সাহসী হ'তে হবে এবং মানস রোগের প্রতিকার চাইলে হ'তে হবে নির্ভীক ও আত্মদোষ প্রতিকারী। আশাবাদীর দৃষ্টিতে জগৎ সুন্দর। অবশ্য তার জগৎ সে নিজে, কিন্তু একথা জানা উচিত একের সৌভাগ্য অপরের দুর্ভাগ্যকে টেনে আনে। এই দৃষ্টিতে দেখতে গেলে এ জগতে শুধু পশুকুল মানুষের ভক্ষ্য নয়—ক্ষমতার ক্রম অনুসারে মানুষের নিজের মধ্যেও গড়ে ওঠে খাদ্য খাদক সম্বন্ধ। এরও নাম মায়া।

মায়ার প্রসঙ্গে আরও বল্লেন স্বামিজী, একটা কথা আমরা শুনি, চরমে মঙ্গল আছে কিন্তু পশু-ভাবাপন্ন বর্ত্তমানে যে চরম অমঙ্গলের খেলা চলছে তার কিন্তু কোন মীমাংসাই নাই।

ডারউইনের ক্রমবিকাশের আলোচনায় আরও শোনা যায়, মানুষ যত নির্দ্দোষ হ'তে পারবে ততই মঙ্গল আসবে। কিন্তু একজন সর্ব্ব-সম্পদে সম্পদশালী ব্যক্তির কাছে এ কথা যত আরামপ্রদ হোক না, লক্ষ লক্ষ জীবন যন্ত্রণায় কাতর ব্যক্তির কাছে এ কথার কোন মূল্যই নাই এবং এই রকম জীবনের সংখ্যাই বেশী। অথচ এদেরই নিষ্পেষিত ক'রে গ'ড়ে উঠেছে তথাকথিত বিদ্বান, ধনী সভ্য সমাজ। আরো দীন অরণ্যবাসীর তুলনায় তাদের এতটুকু অমঙ্গলের আভাসও সহ্য হয় না। একজন শত লাঞ্ছনায় কাতর হ'য়ে পড়ে না—আর একজন একটি কথার ঘায়েও আহত হ'য়ে পড়েন।

অতএব বর্ত্তমান ঘটনার অস্তিত্বই মায়া। বিরূদ্ধভাব এই অস্তিত্বের মূল। যেখানে মঙ্গল সেখানেই অমঙ্গল। অতএব বেদান্ত পেসিমিজম্-অপটিমিজমের একটা মিশ্র মতবাদ। এই মতে কেবলমাত্র সুখের সংসার হ'তে পারে না, সুখ নিতে হ'লে দুঃখকেও নিতে হবে বরণ ক'রে। এবং এই মঙ্গল এবং অমঙ্গল একই সত্ত্বা, ঘটনার পারম্পর্য্যে আজকের মঙ্গল, এক বিষয়ে সুখ, কাল অমঙ্গল এবং আর বিষয়ে দুঃখের কারণ হ'য়ে ওঠে। কিন্তু একটিকে যদি আমি গ্রহণ না করি তা'হলে অপরটিকেও ত্যাগ ক'রতে হবে। জীবন মৃত্যু সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে একটিকে গ্রহণ ক'রলে যখন আর একটিকে গ্রহণ ক'রতে হবে, তখন বেদান্তাদি শাস্ত্র বা ধর্ম্মের প্রয়োজন কি? কারণ যত পুণ্য-কর্ম্মই করনা কেন, সুখ-দুঃখ সমভাবেই ভোগ ক'রতেই হবে। এর উত্তর দুঃখ মোচনের উদ্দেশ্যে তোমাকে কর্ম্ম ক'রতেই হবে—অবশ্য

যদি তুমি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিযুক্ত হও, কারণ এই চেষ্টা, এই সংঘাত জগৎকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এবং এই ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে অগ্রসর হ'তে হ'তেই আমরা জাগ্রত হব। বেদান্ত মতে অনন্তই সান্ত হ'য়েছেন। জার্ম্মাণীর দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তিও তাই। হেগেলের Absolute mind আপনাকে জগতে প্রকাশ ক'রতে চাইছেন—কিন্তু তিনি উপাধিযুক্ত হ'য়ে যেমন জগতে নিজেকে প্রকাশিত ক'রতে চাইছেন তেমনি আবার স্ব-সত্ত্বায় ফিরে যেতেও চাইছেন। বহুত্ব থেকে একত্বে ফিরে যাওয়াই ধর্ম্মের আরম্ভ এবং বৈরাগ্যই ধর্ম্মের সূচনা। খুবই কঠিন সন্দেহ নাই তবু বৈরাগ্য, ত্যাগই জীবনের সত্য বস্তু।

> ন জাতু কামঃ কামান্ উপভোগেন শাম্যতি
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥

কামনার শেষ নাই তাই দুঃখেরও শেষ নাই। এই অন্তহীন কামনার মধ্যে ক্রমাগত চলা যায়—কিন্তু একটি সমাপ্তির শান্তিতে থামা যায় না। এর কারণ সমস্তই মায়াধীন—মায়ার কাজই এই, সুখের সঙ্গে সে রাশি রাশি দুঃখ এনে দেবেই। তবে সব মায়া ব'লে শুভকর্ম পরিত্যাগ ক'রলে চ'লবে না। আমাদের ধীরতা অবলম্বন ক'রতে হবে, কল্যাণ-কার্যাও ক'রতে হবে, পবিত্র ও বৈরাগ্যপ্রবণ হ'তে হবে। তাতে যে তিতিক্ষার সৃষ্টি হবে তাতে আমরা দুঃখ-জয়ী হ'তে পারব। মনে হয় প্রত্যেকটি মানুষ যদি এইরূপ দুঃখ-জয়ী হয়, পবিত্র হয়, তা'হলে 'ডারউইন্‌স্ ল'-এর একটি সার্থক রূপ দেখা যেতে পারে এবং মানব, পশু, কীট, পতঙ্গ নির্ব্বিশেষে একদিন চরম-তত্ত্বে পৌঁছিতে পারে। স্বামীপাদ আরও বল্লেন—জীবন ব'লতে যেন আমরা বুঝতে পারি এ শুধু ইন্দ্রিয়গত নয়—

ইন্দ্রিয়াতীতও বটে। অবশ্য অজ্ঞেয়বাদীর মত স্বতন্ত্র, তাদের কাছে জীবনের ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতাই সব। কারণ তার কাছে বেদান্তের তত্ত্ব অজ্ঞেয়, এও সেই মায়ারই খেলা; তবে একটু লক্ষ্য ক'রলেই বোঝা যাবে কেউই স্ব-অবস্থায় সন্তুষ্ট নয়। সকলেরই একটা ঊর্দ্ধ-মুখী মনোভাব র'য়েছে। সকল ধর্ম, সকল জাতি, উচ্চধর্ম, হীনধর্ম, সবের মাঝে একটী এই গতি লক্ষিত হয়। সকলেই চায় একটা স্বাধীন এবং চরম সত্ত্বায় উপনীত হ'তে এবং সাকারবাদী তার দেবতার মধ্যেও মুক্ত সত্ত্বার চরম প্রতিষ্ঠা দেখতে পান—কারণ তাঁদের দৃষ্টিতে তিনি মায়ার অধীশ্বর। মনে হয়, স্বামিজীর দৃষ্টিতে মায়াবাদের একটি ব্যাপক নোতুন রূপ ফুটে উঠেছে। বেদান্তের বাণীকে তিনি নিয়ে গেছেন একটি নোতুন পথে। বনের বেদান্তকে ঘরে আনার মন্ত্রই যে তিনি পেয়েছিলেন। বল্লেন স্বামিজী, কবে জগতের পূর্ণ মঙ্গলময় রূপ আসবে এই ভেবে আমাদের বসে থাকলে চ'লবে না। আমাদের শিখতে হবে মায়ার প্রতিকূল পথে চলবার মন্ত্র। অবশ্য এ দ্বন্দ্ব জগতে চলছে। এমন কি মনোজগতেও এর ব্যতিক্রম নাই। জয়ী আমরা হবই, কারণ বেদান্তের মতে সেই বিরাট-ই স্বরাট। কাজেই আমাদের মুক্তি তাঁর-ই মুক্তি। মনে পড়ে শ্রীঠাকুরের বাণী,—মানুষ মায়াতে প'ড়ে সব ভুলে যায়, সে যে বাপের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী তা ভুলে যায়।

---

(২)

মানুষের প্রকৃত রূপ কি ? এই সম্বন্ধে আলোচনায় স্বামিজী বলেন মানুষের কাছে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ যত লোভনীয়ই হোক না কেন জগতের অতি বড় ভোগাসক্ত ব্যক্তি হ'তে আরম্ভ করে মুমুক্ষু ব্যক্তির জীবনযাত্রায় একটি প্রশ্ন তাকে বিব্রত ক'রে তুলেছে। এ জগৎ কি সত্য ? এবং এ প্রশ্ন আজকের নয়। এই প্রশ্নই আদি প্রশ্ন। স্বামীপাদের উক্তিতে মনে হয়—এই প্রশ্নই কি জ্ঞান-উষার প্রাক্কালে মানব মনে জাগিয়ে তুলেছিল আত্ম-জিজ্ঞাসা ? যাই হোক স্বামিজী বল্লেন, এই প্রশ্নের কারণ মৃত্যু। মৃত্যু-ভয়ই মানুষকে প্রথম ক'রে তুলেছে সত্যানুসন্ধিৎসু। এই মৃত্যুর করাল গহ্বরের সম্মুখে অতিবড় বাস্তববাদী যে নাকি চায় জীবনটাকে একটি তুচ্ছ সুখের বন্ধনে বেঁধে রাখতে, ভূমার অনুসন্ধান যার কাছে মিথ্যা, শ্রীঠাকুর যাদের সম্বন্ধে বলেছেন, "ত্রিতাপে জ্বলছে তবু বলছে বেশ আছি"—এই চরম মুহূর্ত্তে তারও মনে প্রশ্ন জাগে, একি সত্য ?

সুখ আর আশা এই দুটি মানুষকে পাগল ক'রেছে। অতি বড় দুটি মিথ্যা তত্ত্বের এত শক্তি যে এর কোনদিন বোধ হয় ক্ষয় হবে না। কিন্তু কালের ধর্ম্মে, জীবন সায়াহ্নে যেদিন মানুষ দাঁড়ায় একটা অচেনা রহস্যের সামনে, তখন বোঝে কত বড় মিথ্যার পিছনে সে ছুটেছিল। কিন্তু কেন ? শূন্যবাদী ব'লবেন ত্রিকালরূপ একটা অনন্ত শূন্যের মধ্যে আমরা ভেসে চলেছি। কিন্তু এ চিন্তা সাধারণের জন্য নয়। তার চেয়ে—সত্য-অনুসন্ধানী হও, বুঝতে চেষ্টা কর—এই দেহই সব নয়, দেহাতীত সত্ত্বা একটি আছে, যে চির অবিনাশী। বৈদিক ঋষিগণ যাঁকে জানিয়েছেন শ্রদ্ধা—তোমরা তাঁকেই খোঁজ।

কিন্তু একটি জিনিষ মনে রাখতে হবে যে, প্রায় সমস্ত ধর্ম্মের মতেই, আমরা ক্রমবিকাশের পথে ক্রমোন্নত হ'তে পারছি না; হ'য়ে পড়ছি অবনত। পাশ্চাত্য ধর্ম্মশাস্ত্রের জলপ্লাবনের তত্ত্বে ঐ এক কথারই প্রতিধ্বনি। হিন্দু শাস্ত্রের তো কথাই নাই। মানুষের শুদ্ধ সত্ত্বার ভেতর যতখানি অশুদ্ধতার সংমিশ্রণ হচ্ছে এবং তার সংখ্যা যত বাড়ছে ততই সে অবনতির পথেই এগিয়ে চলেছে। অথচ আমরা অর্থাৎ আধুনিক সভ্য সমাজ মনে ক'রছি আমরা একটা অবিশ্বাস্য উন্নতির আদর্শের দিকে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু ভেবে দেখা দরকার এটা সত্য কি না? সে যুগের সাহিত্যে, সে যুগের দর্শনে, সে যুগের ধর্ম্ম নেতাদের চিন্তাধারায়, যে গভীর সত্যের নিদর্শন আমরা পাই, যার জন্য আমরা পুরাতনের ভিত্তিটুকুকে প্রাণ ধ'রে ত্যাগ ক'রতে পার না—ঠিক সেই সত্যের গভীরতা এ যুগের তথাকথিত সাহিত্য বা দর্শনে পাই কি না? মনে হয় পাই না। সে যুগের ধর্ম্ম-কুসংস্কারে মানুষ পেত আলোর দিশা। এ যুগের বিজ্ঞান-রূপ কুসংস্কারে শুধু অন্ধকারের অদিশা। স্যার জেমস্ জিন্স তাঁর ফিজিক্স এ্যাণ্ড ফিলোজফিতে এই ধরণের কথাই ব'লেছেন। ধরা যাক—সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাপারে; পৌরাণিক মতকে আধুনিক মতবাদীরা উড়িয়ে দিতে গিয়েও নিয়েছে তারই সাহায্য। আমাদের দশাবতার তত্ত্ব—আর বিজ্ঞানের সৃষ্টিতত্ত্ব, মলাস্ক থেকে মানুষের পরিণতি, এ দুটোই পাশাপাশিই যায় না কি? শ্রীঠাকুরও ব'লেছেন,—সেই এক থেকে অনেক হ'য়েছে। নিত্য থেকে লীলা—লীলা থেকে নিত্য, এও সেই ইভলিউশন্ ডিভলিউসানেরই আদি ধ্বনি, অবশ্য দিব্য দৃষ্টি ভঙ্গীতে। বল্লেন স্বামিজী—একটা প্রশ্ন ওঠে, এই দেহের

স্রষ্টা কে ? কোঁতের পসিটিভিস্‌ম্‌ যদি ধরা যায় তা'হলে আত্মা দেহকে সৃষ্টি করেনি। দেহের গঠন-শৈলীতেই একটি শক্তি সৃষ্টি হ'য়েছে। তাকেই নাকি আমরা আত্মশক্তি বলি। কিন্তু সে কখনই সম্ভব নয়। একটি বিরাট ম্যাটারের অংশ এই দেহ। এনার্জি ছাড়া কে তাকে বিরাট ম্যাটার থেকে ভিন্ন ক'রে নিয়ে একটা বিশেষ রূপ দেবে ? বরং বলা যেতে পারে, এনার্জিরই গতি চঞ্চলতার প্রাবল্যে জড়ের সৃষ্টি। অর্থাৎ স্বামিজী মহারাজের মতের অর্থ এই মনে নয় —একটি বিরাট এনার্জির খেলায় সৃষ্টি হ'ল ঘনীভূত বিরাট ম্যাটার—এবং সেই আদি প্রাণের আবেগই আবার তাকে বহু খণ্ডে খণ্ডিত ক'রে তার মধ্যে নিজেকে অনুস্যূত ক'রে রাখল—অর্থাৎ সীমার মাঝে র'য়ে গেল অসীমের বাস্তব প্রকাশ। শ্রীঠাকুরের কথায়, জড়ের সত্ত্বা চৈতন্যে লয়, চৈতন্যের সত্ত্বা জড়ে লয়। এখন এই শক্তিটি কি ? স্বামিজী বল্লেন,—কোন কোন শাস্ত্র বলেন, এ শক্তি জ্যোতিমণ্ডিত সূক্ষ্ম-দেহধারী পুরুষ। তিনি আমাদের মনের আধার। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে Matter হ'চ্ছে Bottled energy (De. Brogli প্রভৃতি)

ভৌতিক দেহ নির্ম্মাতা যেমন পরমাণু, তেমনি এই সূক্ষ্ম দেহের নির্ম্মাতা হ'চ্ছেন আত্মা। এই সূক্ষ্ম দেহের মাধ্যমে তিনি নিজের কাজ ক'রে যাচ্ছেন। আত্মা কিন্তু দেশ কাল নিমিত্তের অতীত, মনের অতীত। কারণ দেশ-কাল-নিমিত্ত যেমন পরস্পর পরস্পরের অন্তর্গত, এই তিনটিই আবার সম্মিলিতভাবে মনের অন্তর্গত। আর আত্মা স্বয়ং নিরাকার। তাঁর কোন রূপ নাই, অনন্তত্বই তাঁর স্বরূপ লক্ষণ। এই আত্মাই মানুষের স্ব-রূপ। এবং আত্মা যদি অনন্ত

হয় তবে স্বরূপ-গত-ভাবে আমরাও অনন্ত, এবং এক। তবে এই ভিন্ন ভিন্ন দেহধারী জীবগুলি কি? এই প্রশ্ন স্বতঃই ওঠে। এগুলি সেই বিরাট একের সসীম প্রতিচ্ছায়া মাত্র। তাকে আমরা বলি ব্যবহারিক জীব। এই ব্যবহারিকভাবে সে বন্ধন-যুক্ত কিন্তু স্বরূপে সে মুক্ত। শ্রীঠাকুরের ভাবোক্তিতেও পাই, এক একটি ঘট যেন এক একটি জীব। প্রতিবিম্ব সূর্য্য ধ'রে ধ'রে সত্য সূর্য্যের কাছে যাওয়া যায়। শেষের ঘটটি ভেঙে দিলে কি থাকে মুখে বলা যায় না।

আর কোন কোন মতে বন্ধন-যুক্ত বলে প্রতীয়মান হ'লেও জীব সত্যই তা নয়—সে সর্ব্বব্যাপী অনন্ত, তার জন্ম মৃত্যু কিছুই নাই। কারণ এক নিত্য অনন্তের মধ্যে চলে যাওয়া বা ফিরে আসার স্থান কোথায়? এই শরীর বা মন যা দেখছি সে তো কতকগুলি ঘটনার পারম্পর্য্য মাত্র, এবং ক্ষণ-ভঙ্গুর ও চঞ্চল। কাজেই এরা আত্মার রূপ নয়। আত্মা অপরিবর্ত্তনীয়। যা খণ্ড তারই স্থান পরিবর্ত্তন বা পরিণাম ইত্যাদি থাকে। কিন্তু সবই যদি এক বলা যায় তবে ছোট বড়র তুলনা, ভালমন্দের পরিণাম, স্থানান্তর ইত্যাদি কার সঙ্গে বা কোথায় হবে? সুতরাং এইটিই মানুষের পারমার্থিক রূপ—প্রকৃত স্বরূপ। ভয় পেয়ো না, 'আমি' ব'লে যাকে সম্বোধন করছ, সে আমির খোঁজ এখনও পাওনি। ভৌতিক অস্তিত্বে সে যদি অস্তিত্ববান হ'ত, তা'হলে ইন্দ্রিয়ের ক্ষুণ্ণতায়, জগতের ক্ষুণ্ণতায়, মানসিক ক্ষুণ্ণতায় তার অস্তিত্বের অংশগতভাবে বিনাশ হত, কিন্তু তাতো হয় না। ঠাকুর ব'লেছেন,—তুমি কে বল দেখি—তুমি তিনিই। কিন্তু আমরা সেই ক্ষুদ্র অহং-যুক্ত জীবনটাকে ধরে রাখি

বলেই ক্ষুদ্র মৃত্যুটিকেও ধ'রে রাখতে বাধ্য হই। যদি মানুষ নিজেকে বিরাট অখণ্ড জীবনের সঙ্গে নিজের খণ্ডত্বকে যুক্ত ক'রতে পারতো তা'হলে সনিশ্চয়ই মৃত্যু-ভয় জয় ক'রতে সক্ষম হত। স্বামিজী বল্লেন, মনে রেখো, তুমি যা তাই আছ, এখানে ক্রমবিকাশের পথে উন্নতি-অবনতির কোন মূল্য নাই। তোমার সামনে একটি আবরণ, তার একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে তোমাকে দেখা যাচ্ছে। ছিদ্রটি যবনিকাটিতে পরিব্যাপ্ত হলে তুমি হবে স্বপ্রকাশ। সাধনার ক্ষেত্রে সেই কথাই তোমার উপলব্ধি হবে যে তুমি যাকে খুঁজছ, সে তোমার অন্তরেই। তুমিই আমি, আমিই তুমি, এইভাবে স্বামিজী তাঁর আলোচনাকে বেদান্তের একটি চরম তত্ত্বে এনে উপস্থিত করলেন।

স্বামিজী বল্লেন, একদিক দিয়ে দেখলে জানার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কে কাকে জানবে? একটি গভীর যবনিকা। তার অন্তরালে যা আছে তা স্ব-সংবেদ্য। তিনি বিষয় নন, বিষয়ী। তিনিই তোমার আত্মা। শুধু ঐ যবনিকাটি সরিয়ে ফেলতে হবে এবং সেই প্রচেষ্টাই চলছে সর্ব্বজীবের জীবন সাধনায়। সে সাধনার এক এক টিরূপ যদি ব্যাখ্যা করা যায়, দেখা যাবে সবেরই ভিত্তি হ'ল, আমার এই ক্ষুদ্র 'আমি'র সর্ব্বব্যাপ্তির উপলব্ধি। এই উপলব্ধি হতেই আসে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা, দয়া, সহানুভূতি, ক্ষমা, অহিংসা সর্ব্বোপরি নৈতিকতা। আমরা যখনই আমাদের ক্ষুদ্র অহংটাকে বিসর্জ্জন দিয়ে একটা ভূমার আমিত্বে প্রতিষ্ঠিত হই তখনই আমরা হই আত্মত্যাগী, স্বার্থত্যাগী—অর্থাৎ মানুষে মানুষে যে ভালবাসা সেটা বিরাট আত্মার প্রতি ভালবাসা। শুষ্ক জ্ঞানযোগের অসীম

আত্মতত্ত্বকে, এমনি একটি সীমার সরসতায় এনে দিতে তিনিই পারেন যিনি এ যুগের মূর্ত্ত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পেয়েছিলেন জীবকে শিবস্বরূপে সেবা করার মন্ত্র। বল্লেন স্বামিজী—এই আত্মজ্ঞান লাভের একটি প্র্যাগম্যাটিক ভ্যালুও আছে, কিন্তু সেটি ক্ষুদ্র নয়—বিরাট। মিথ্যা সুখান্বেষী, জীবনে কোনদিন শান্তি পায় না। এবং নিজেকে দেহ-বুদ্ধি-যুক্ত মনে ক'রে খণ্ড ভাবাপন্ন হওয়ার ফলেই জগতে এত অশান্তি দ্বন্দ্ব-সংঘাত। হয়তো আমরা ভয় পাব এবং এই বিরাট ভাব আমাদের ধারণারও বাইরে বলেই মনে হবে কিন্তু এইটিই সৃষ্টির আদি সত্য। অসম্ভব বলে মনে হ'লেও এই সত্যকে আমাদের প্রকাশিত ক'রতেই হবে। এতে যদি তোমরা অক্ষম হও তবে তোমাদের সমাজ গৌরব, শক্তির অহংকার, সবই বৃথা—একটি চরম সত্যকে প্রতিষ্ঠা ক'রতে পারাই সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব। দেহ বুদ্ধি তখনই গেছে বুঝব যখন মৃত্যুকে বরণ ক'রে নিতে পারব—বলতে পারব, আত্মা বিজ্বর, বিমৃত্যু, বিশোক। তিনিই সাহসী এবং মুক্ত পুরুষ যিনি নিজেকে জীবন মৃত্যুর পারে বলে মনে করেন। তবে এ জ্ঞান, সাধন সাপেক্ষ। শ্রবণ মনন ইত্যাদি সে সাধনের অঙ্গ। জোর ক'রে বলতে হবে আমি মুক্ত। শুধু কর্ম্মের জন্য চরম সত্যকে ভুলে যাওয়া ঠিক নয়, জোর ক'রে বলতে হবে—আমি মুক্ত, শুদ্ধ, পবিত্র—আমি বন্ধনহীন। আমার রোগ, শোক নাই—আমি আকাশের মত উদার। অবশেষে বল্লেন স্বামিজী—আর অসতের দিকে নয়, এবার সকলকে বলতে হবে, তুমি পরমতত্ত্ব—শুধু আবরণটি সরিয়ে দাও। চিন্তা যদি ক'রতেই হয় চিন্তা কর বেদান্তের চরম মন্ত্র—সোহহং সোহহং। মনে রেখো

তোমাকে, আমাকে, আমাদের সকলকে চরম সত্যে পৌঁছুতে হবে—কাজেই আর বসে থাকলে চলবে না। উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত—প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

---

(৩)

গ্রন্থের এই অঙ্কে স্বামিজী মায়া এবং ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা কেমন ক'রে মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তারি আলোচনা ক'রছেন। প্রসঙ্গক্রমে একটি রহস্যজনক কথার তিনি উল্লেখ ক'রে বলেছেন, ক্রমবিকাশের মুখে আমরাও যেমন একটি উন্নত জাতিতে পরিণত হয়েছি দেবতা বা ঈশ্বরও সেইরূপ একটি ক্রমোন্নত সত্ত্বায় পরিণত হ'য়েছেন। এটি একটি অত্যাশ্চার্য্য ধারণা সন্দেহ নাই কিন্তু স্বামিজীর আলোচনার মুখেই আমরা পাব এর মীমাংসা। বলেছেন, মায়া বা ভগবৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান কেমন ক'রে এল—এর বিচার ক'রতে গেলে আমাদের সর্ব্বাগ্রে আদি মানব সমাজের দেবতা-বাদে ফিরে যেতে হবে অর্থাৎ তখন মানুষের মনে দেবতা সম্বন্ধে কি রকম ধারণা ছিল। অবশ্য এখনকার দৃষ্টিতে তা অতি নিম্নস্তরের হলেও তখনকার সমাজের মানুষের কাছে তাই ছিল একান্ত ভক্তির বস্তু, সে যুগের দেবতারা এ যুগের সভ্য সমাজের রুচি বিরুদ্ধ বহু অসঙ্গত কাজই নাকি ক'রতেন, অথচ সে যুগের মানব তার কোন প্রতিবাদই নাকি করেন নি। আমরা আশ্চার্য্যান্বিত হব সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন ব্যক্তির বিচার ক'রতে গেলে তার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তো বিচার ক'রতে হবে, সেক্ষেত্রে নিন্দা আমাদের করা চলবে না।

এমনকি সে যুগের সমাজের উপযুক্ত দেবতা নিষ্ঠুর জিহোবার সঙ্গে এ যুগের কোন দেবতার তুলনামূলক আলোচনায় জিহোবা কখনই নিন্দনীয় হ'তে পারেন না। এবং পরবর্ত্তী যুগেও আমাদের এ যুগের ধর্ম্মকে অবনত বলে পরিহাস করা চলবে না। কিন্তু তবু গীতার বাণী—"সূত্রে মণি গণা ইব"—মন্ত্রের তাৎপর্য্যে আমরা বলব সে যুগ ও এ যুগ আচারে ও আদর্শে ভিন্ন হ লেও পরস্পরের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম সংযোগসূত্র নিশ্চয় আছে এবং তাকে খুঁজে বের করাই বেদান্তের কাজ।

বেদান্তের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ ক'রলে দেখা যাবে, মানুষের উন্নতি অবনতির যদি বিচার করা যায় তবে দেবতারই বা কেন যাবে না? কারণ মানুষের ভেতরে তো তিনিই আছেন। যখন মায়া-যুক্ত তখন বলছি—অবনত। যখন মায়ামুক্ত তখন বলছি—উন্নত। ঈশ্বরও তেমনি মানুষের একটি ভাবের প্রকাশ, তাঁর প্রকৃত স্বরূপ কেউই ধ'রতে পারে না। মানুষের মনে যখন যে ভাব এসেছে তার ঈশ্বরও তখন সেই রূপই ধারণ ক'রেছেন অর্থাৎ মানুষের মনের ক্ষেত্র যেমন যেমন তৈরী হ'য়েছে দেবতাও তেমনি তেমনি ভাবে আত্মপ্রকাশ ক'রেছেন এইটীকেই বলা হ'চ্ছে দেবতার ক্রমবিকাশ। স্বামিজীর এই কথা যেন শ্রীঠাকুরের কথারই প্রতিধ্বনি। শ্রীঠাকুর যেমন বলেছেন তাঁকে কখনও ভাবি ভাল, কখনও ভাবি মন্দ। বল্লেন স্বামিজী, সে যুগে মানুষের বুদ্ধির ক্ষেত্র এত স্বল্প পরিসর ছিল যে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, এ বিচার তাদের ছিল না—তারা ছিল প্রবৃত্তির দাস—যেটা ভাল ব'লে মনে হতো, মন্দ হ'লেও তাদের সে কাজ ক'রতে কোন আপত্তিই হ'ত না। তাই তাদের

কল্পনায় দেবতাকেও তারা সেই রূপই দিয়েছিল। ক্রমে মানুষের মনে নৈতিকতার একটা মূল্য বোধ জাগ্রত হ'ল। প্রতিক্ষেপে তার বুদ্ধি তা'কে সচেতন ক'রে দিতে লাগল যার ফলে এই শুভ সংশয়ের সৃষ্টি—কোন্‌টা ভাল? কোন্‌টা মন্দ? মানুষের মনে তখন থেকে প্রবৃত্তির সঙ্গে এসে যোগ দিল নিবৃত্তি। ধীরে ধীরে এই নিবৃত্তি আবার মানুষকে দেখালো প্রকৃত ধর্ম্মের পথ—কোন্‌টা শুভ বা অশুভ; যাকে আমরা বলি অন্তর-দেবতার বাণী। মানুষের মানস ক্ষেত্রের পরিধি বুঝে দেবতাও নিজেকে তেমনি ভাবেই প্রকাশিত ক'রলেন। তারপর এল ভালবাসা। মনে হয় স্বামিজী এই ভালবাসার অর্থ বলেছেন, দিব্য জীবনের প্রতি ভালবাসা—অথবা ভালবাসার মধ্যে ঘনীভূত ভাব—যে ভালবাসা স্বামিজীর মতে প্রথম আত্মীয়গত, পরে সমাজগত ও জাতিগতরূপে পরিণত হয়েছিল। দেবতাও সেইরূপই ধারণ ক'রেছিলেন। এক এক দেবতা ছিলেন একটি সমাজ বা জাতির উপাস্য ও পরিত্রাতা। এবং বংশপতিও ছিলেন যথা সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ। তারপর এল জাতিতে জাতিতে, সমাজে সমাজে একটা পারস্পরিক সহানুভূতি, ক্ষমা, সহিষ্ণুতার প্রবৃত্তি। এর পর জগতের অভিমানিনী দেবতাদের কার্য্যকলাপেরও ভালমন্দের প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ ক'রলো। তার ফলে মানুষ তার ভাবমূর্ত্তি দেবতার রূপ পরিবর্ত্তিত ক'রে তাকে দিল একটি আদর্শ আসন—বললো তিনি নীতিপরায়ণ, তিনি প্রেমময় এবং সর্ব্বশক্তিমান। কিন্তু এর ফলে এ্যারিথমেটিক্যাল এবং জিওমেট্রিক্যাল প্রগ্রেসন অনুযায়ী ঈশ্বরের গুণ, ও সন্দেহবাদ দুই যুগপৎ বেড়ে চলল। প্রশ্ন উঠলো কল্যাণময় যিনি তাঁর জগতে এত অশুভ

অকল্যাণ কেন ? কেন আমাদের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও আমরা আদর্শকে নষ্ট ক'রে বসছি ? শুধু তাই নয় একটি উচ্চ আদর্শের দিকে গতি নিলে, কেন, প্রতিপদে আসছে বাধা ? মন্দ পথে যাচ্ছি তাতেও সুখ নাই আবার ভাল পথে চলেও ততোধিক দুঃখ লাভ করছি। কেন এর কারণ কি ? প্রতি মুহূর্তের এই কেনর প্রশ্ন থেকেই মানুষের মনে জেগে উঠলো একটি অনির্ব্বচনীয় রহস্যময় তত্ত্বের ধারণা—তারি নাম মায়া। আমাদের মনে এই ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হ'ল যে আমরা এই মায়ার অধিকৃত জীব ব'লেই জ্ঞান অজ্ঞান, সত্য মিথ্যার একটি মিশ্রিত কুহেলীতে বাস করছি, যার ফলে—বিশ্বানুগ বা বিশ্বাতীত কোন তত্ত্বেরই একটি সু-মীমাংসিত অবস্থায় পৌঁছতে পারছি না।

স্বামিজীর এই ভাষণে আমরা শ্রীঠাকুরের একটি বাণীর ভাবও খুঁজে পেলাম—"যা কিছু দেখছ সবই মায়ার ভেতর"—তার পেলাম, আলোর সঙ্গে অন্ধকারের জ্ঞানের মত ঈশ্বর-তত্ত্বের ক্রম-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মায়া-তত্ত্বের প্রকাশও মানুষের মনে যুগপৎ জেগে উঠেছে।

পরে স্বামিজী যেটুকু বল্লেন তার মর্ম্মার্থ, ক্রমবিকাশের বা ক্রমোন্নতির পথে, মানুষের উন্নততর চিন্তার পথে এবং সংশয় ও ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির পথে ঈশ্বর ও মায়ার যে চরম-তত্ত্বে আমরা পৌঁছেছি, প্রাচীন ধর্ম্মমত তার থেকে বহুগুণ অবনত হ'লেও তাই হ'চ্ছে নবগঠিত ধর্ম্মের ভিত্তি, কাজেই তা'কে রহস্যচ্ছলে উড়িয়ে দেওয়া চল্‌বে না। অবশ্য ভারতের সে গুণ আছে, এ আমাদের স্বীকার ক'রতেই হবে। পাশ্চাত্যে যেমন সমাজ স্বাধীনতা আছে

প্রাচ্যে তেমনি আছে ধর্ম্মে স্বাধীনতা। এবং তারা কা'রো ব্যক্তিগত ধর্ম্মে হাত দেয়নি, তা সে ধর্ম্ম যত হীনাচারযুক্ত হোক না কেন এবং এই ঔদার্য্যের ফলেই ভারতের বেদান্ত, ব্রহ্মতত্ত্বের মত উদার নিত্য-শুদ্ধ ও পরম-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ক'রতে সক্ষম হ'য়েছিল।

---

(৪)

এর পরের অধ্যায়টি মায়া এবং মায়া-মুক্তির সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত আলোচনা। আমরা যখন জগতে আসি তখন কি সুখকে সঙ্গে নিয়ে আসি—না দুঃখকে? রহস্যজনক এই প্রশ্ন। একটা জিনিষ লক্ষ্য ক'রলেই দেখা যাবে মানুষ প্রথম ভূমিষ্ঠ হ'য়েই সুরু করে কাঁদতে, সে ধনীই হোক আর দরিদ্রই হোক। কিন্তু যতই দিন যায় বাল্য-কৈশোরের এক একটা ধাপে সে তার মানস ক্ষেত্রে একটি জিনিষ আবিষ্কার করে, তার নাম আশা—বড় প্রহেলিকাময়ী এই আশা। সেই মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে যায় জীবনের অন্তহীন পথে কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, পা ফেলার পথটুকু ছাড়া মানুষ সামনে পিছনে আর কিছুই দেখতে পায় না। যা দেখলো তা মরীচিকার মত পরক্ষণেই মিলিয়ে গেল। মৃত্যুর কাল গহ্বরে হারিয়ে গিয়ে তবে তার মুক্তি। এরই নাম মায়া—শ্রীঠাকুর যার কথায় ব'লেছিলেন—মহামায়ার মায়া যে কি দেখালে, ঘরের ভেতর ছোট্ট জ্যোতি বাড়তে বাড়তে জগৎটাকে ঢেকে ফেলতে লাগলো।

সকলেই আমরা সেই মায়ার হাতের ক্রীড়নক। বৈজ্ঞানিক ভাবছেন তিনি নিত্য নূতন আবিষ্কার ক'রছেন কিন্তু তিনি যত বড়

আবিষ্কারই করুন না, সে তো কতকগুলো জড়ের খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। বৈদ্যুতিক আবিষ্কার, মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কার, যে কোন আবিষ্কার হোক না কেন—কতকগুলো জড় পদার্থকে নিয়ে নাড়াচাড়া করা ছাড়া গৌরবের আর কিছুই নাই। এসব মায়া। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এই মায়ার সহায়ক, ইন্দ্রিয়-মন, মানুষকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ভোগ সুখের দহনলীলার দিকে, পতঙ্গের মত। বুদ্ধি চাইছে জগৎ রহস্যের একটি মীমাংসা। তার জন্য চ'লছে আপ্রাণ চেষ্টা, অনুসন্ধান, কিন্তু এখানেও অকৃতকার্য্যতা—দেশ কালের অনন্ত বাধা লঙ্ঘনে সে হ'চ্ছে অসমর্থ। শ্রীঠাকুরও এই জগৎকে জানার কথায় ব'লেছেন, জগৎ কি এতটুকু যে জানবে। কিন্তু তথাকথিত বুদ্ধিবাদী মনে করে, আমরা সর্ব্বজ্ঞ হ'তে সক্ষম কারণ আমরা স্বাধীন। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা যায় আমরা অতিবড় পরাধীন। খুব ছোট উপমা থেকেই ধরা যাক—স্নেহের অধীন জননী তাঁর শিশুটিকে ভাবেন তাঁর অন্তরের বস্তু—তাঁর একমাত্র সহায়, কিন্তু সেই ছেলেই তাঁর বুকে হানে বিষম আঘাত। কিন্তু তবু স্নেহ এমনি বস্তু, কোন মতেই সে ভুলতে দেয় না তার স্নেহের অবলম্বনটীকে। এ সবই মায়া, শত তত্ত্বকথাতেও মানুষ বুঝেও পারে না বুঝতে। অথচ জগতের প্রতিটী জীব তার প্রত্যেকটি অনুপরমাণু, এক কথায় সমুদয় বিশ্বই একটা নিশ্চিত বিনাশের দিকে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু একটা নেশার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে সে ভুলতে চাচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর সত্যটাকে, ইন্দ্রিয়-সুখ সেই নেশা।

এই ইন্দ্রিয় সুখবাদই উনবিংশ শতাব্দীর মন্ত্র। এ যুগের মর্ম্ম-বাণীই হ'ল যে, "ঋণ করেও ঘি খাও"—সুখ পেতে গিয়ে শত

লাঞ্ছনা ভোগ কর ক্ষতি নাই—শত বন্ধনের মাঝেই যন্ত্রণাকে বুকে জড়িয়েই তুমি ভাব, তুমি মুক্ত। এক কথায় মিথ্যার ক্রীতদাস হও—কিন্তু ফল কি হয়েছে তাতে? দ্বন্দ্ব, সংঘাত, হিংসা আর বিদ্বেষ। এ বন্দীদশার জগৎ থেকে যদি বাঁচবার এতটুকু প্রত্যাশাও কারো থাকে তবে একটি পথ আছে—সে পথের নির্দ্দেশ দিয়েছেন গীতামুখে শ্রীভগবান স্বয়ং, "দৈব হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া—মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" মনে রেখো জীবনের ক্ষমতার প্রাধান্যে যে সুখবাদের নেশা তোমার কাছে পরম লোভনীয় মনে হচ্ছে, কাল মহাকালের অলঙ্ঘ্য নিয়মে জীর্ণ দেহ মনে সেই সুখবাদই হবে চরম দুঃখের কারণ; তখন ভগবানের এই বাণীই হবে একমাত্র সম্বল—"হে জীব আমার দুরতিক্রম মায়া যদি অতিক্রম করতে চাও তবে আমার শরণ নাও।" বাস্তব-ধর্ম্মীদের কথায় ভুলো না। বুদ্ধদেবকে যখন 'মার' নানা প্রলোভনে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করেছিল তখন তিনি তাকে এই বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, "অজ্ঞানাচ্ছন্ন হ'য়ে ভোগসুখে জীবন কাটানোর চেয়ে মৃত্যুও শ্রেষ্ঠ। যেমন পরাজিত জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যুদ্ধক্ষেত্রে বিসর্জ্জিত জীবন।" মায়া-মুক্তির পথে এই জীবনের সুদৃঢ় ভিত্তি খুব প্রয়োজন। জীবনে যখন একটা পরম জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে যে পরম জয় মানুষকে একটা পরম নির্ভরতায় দাঁড় করিয়ে দেয়, তখন সে যত ক্ষুরধার পথই হোক না, গভীর আত্মবিশ্বাসে সেই পথেই চল। এই রকম পথের কথায় স্বামিজীর উক্তিতে যে ভাব আমরা পাই সেটী শ্রীঠাকুরের বাণীরই অনুগামী "যত মত তত পথ, সকল ধর্ম্মই সত্য"। ছাতে উঠবার উপমাও দিয়েছেন ঠাকুর।

অর্থাৎ ছাতে উঠতে চাইলে যে কোন সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই পৌঁছতে পারবে। কেউ ভাল সিঁড়ি দিয়ে ওঠে, কেউ বাঁশের মই দিয়ে, কেউ দড়ির সিঁড়ি দিয়ে ওঠে। সকলেই পৌঁছতে পারবে—উদ্দেশ্য যদি থাকে ছাতে ওঠা। স্বামীজীও বল্লেন—চরম বলতে একটি পথ নয়—এ পথের নানা রূপ, বিভিন্ন ধর্ম্মমতই এই চরম সত্যে পৌঁছবার ভিন্ন ভিন্ন পথ। সকলেরই ভিত্তি এক। সব ধর্ম্মেরই মূলে একটি নিত্য-মুক্ত সত্ত্বা আছে, তাকে এক এক ধর্ম এক এক নামে বিশেষিত ক'রেছে। এবং কিছু বিরোধও যে না আছে তা নয়, কিন্তু একটা সূক্ষ্ম সংযোগস্থল পরস্পরের মধ্যে নিশ্চয়ই আছে এবং সকলেরই একটি সার্ব্বিক ভাব আছে, সেটি হচ্ছে মায়া থেকে মুক্তির পথে ছুটে চলা। শ্রীঠাকুরের ভ ষায় একে বলা যেতে পারে—সেখানে সব শেয়ালের এক রা।

Pide Piper-এর বাঁশী যেমন সেই মন্ত্রমুগ্ধ শিশুদের মধ্যে একই সুরের একটি অনুরনণ তুলেছিল, তাদের ডেকে নিয়ে গিয়েছিল একটি সুর-লোকের আনন্দে, মুক্তির বাণী ঠিক তেমনি ক'রেই আহ্বান ক'রছে জগতের প্রতিটি অনুপরমাণুকে তার বন্ধনহীন একটি আনন্দ স্থিতিতে।

মায়া ও মুক্তি তত্ত্বের আলোচনায় স্বামিজী এক সময় এমন একটি তত্ত্বে এসে উপস্থিত হ'লেন যেখানে ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির সমস্ত ধারা যেন বিরাট অখণ্ড দেশকালে কেন্দ্রীভূত হ'য়ে পড়ল, তার ঘটনা চঞ্চলতাও সেখানে অচঞ্চলতার প্রতীক।

বল্লেন স্বামিজী—একদিক থেকে দেখলে বন্ধন বলে কিছুই নাই। মুক্তিতেই ঘটছে জগৎ সৃষ্টি, মুক্তির মধ্যেই তার স্থিতি—আবার

মুক্তির পরমেই তার প্রলয়। সমস্ত সমাজ, সমস্ত জাতি সেই এক ভাবেরই ভিন্ন প্রকাশ—যার ফলে অনির্ব্বচনীয় মায়া—দুরত্যয়া মায়া আমাদের গভীর বন্ধনে বেঁধে রাখতে চাইছে। কিন্তু অন্ধকারের সঙ্গে আলোর বোধের মত একটি মুহূর্ত্তেই আমাদের দুটি অভিঘাতই সৃষ্টি হ'চ্ছে, বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত মুক্তির বাণী। ঐ আলোর রশ্মিই তোমার চোখের সমস্ত কুয়াশাকে ছিন্ন ক'রে জগৎটাকে তুলে ধরে আনন্দের পটভূমিতে। তোমাকে নিয়ে চলে নৈতিকতার পথে। তুমি বুঝতে পার বিশ্বের মধ্যে যত দ্বন্দ্ব, যত সংঘাত, যত প্রতিযোগিতা সমস্তই সেই আদি স্ফোট। ব্রহ্মকে জানবার উদ্যম, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রের আপন আপন কেন্দ্র পরিক্রমার লক্ষ্যও সেই আদি ধ্বনির অন্বেষণে। সে অনাহত সুর অনাদি সুর শুনবার চেষ্টা কর, ঠিক বুঝতে পারবে ভাল মন্দ, সৎ অসৎ, সমস্ত কিছুরই গতি সেই একদিকে। তাই তাদের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা ডিগ্রীর পার্থক্য কেউ আগে, কেউ পিছে। একদিন না একদিন সকলেই পৌঁছবে।

এই পরম মুক্তি পরম একই বেদান্তের বেদ্য—এইখানেই তার সুরু। প্রাচীন যুগে যখন মৃত আত্মা ছিল দেবতা, তখনও ধর্ম্মে প্রচ্ছন্ন ভাবে এই মুক্ত সত্ত্বারই প্রকাশ ছিল। উন্নত ধারণার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রপঞ্চাতীত সত্ত্বার বহু দেবতার রূপে প্রকাশ। কিন্তু তিনি তখনও আমাদের থেকে অনেক দূরে। সেই পরম দূরই একদিন আবার পরম নিকট হ'য়ে উঠল, প্রকৃতির ঈশ্বর থেকে হৃদিস্থিত হৃষিকেশ রূপে। এবং সেই হৃদিস্থিতকেই একটি অখণ্ড তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত ক'রল বেদান্ত। শ্রীঠাকুর বল্লেন—"তিনিই তুমি।" সেই দৃষ্টি ভঙ্গীতেই স্বামিজী বলেছিলেন, তুমিই চরম তত্ত্ব, তোমাকে মায়া

আচ্ছন্ন ক'রতে পারে না। তুমি মুক্তি স্বরূপ। তুমি শুধু স্বপ্ন দেখছিলে—জাগ্রত হও, তাহলেই বুঝতে পারবে তুমি নিত্য স্বানুভবানন্দে প্রতিষ্ঠিত।

---

(৫)

ইচ্ছা ও অদ্বৈত বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব এই দুটি তত্ত্বকেই সোপেন-হাওয়ার বলেছেন একই তত্ত্ব। স্বামিজী তাঁর "ব্রহ্ম জগৎ" এই পরিচ্ছেদটিতে সোপেন হাওয়ারের কথার প্রতিবাদ করে যে কথা বল্লেন, তার থেকে আমরা বুঝতে পারি অদ্বৈত বেদান্তের ব্রহ্ম 'ইচ্ছা' স্বরূপ নন। উপনিষদে যে ব্রহ্মের সৃসৃক্ষার কথা উল্লেখ করা হ'য়েছে সে ব্রহ্মের লক্ষণ সগুণাত্মক। স্বামিজী বল্লেন, চিন্তা, ইচ্ছা এ সমস্তই একটি গতি। তাদের পরিবর্ত্তনশীলতা কখনই চির অপরিবর্ত্তনীয় ব্রহ্মতুল্য হ'তে পারে না, অদ্বৈত বেদান্তের ব্রহ্ম নির্গুণ এবং দেশ-কাল-নিমিত্তের বাইরে। জগৎ "ব্রহ্মৈব নাপরঃ" এ কথার অর্থ তাহলে স্বামিজীর মতে ব্রহ্মের জগৎ রূপে পরিবর্ত্তন হওয়া নয়। আমরাই ব্রহ্মকে দেখি দেশ-কাল-নিমিত্ত অর্থাৎ মায়া পরিচ্ছিন্ন অবস্থায়, যা তাঁর স্বরূপ লক্ষণ নয়। কার্য্য কারণ যা কিছু সমস্তই প্রপঞ্চের অধীন। কারণ গতিশীলতা বা পরিবর্ত্তনই তাদের স্বধর্ম্ম। কিন্তু ব্রহ্ম অপরিণাম স্বাধর্ম্মে চির অচঞ্চল তাই তাঁর কার্য্যও নাই, কোন কারণও নাই—তাঁকে সৃষ্টি বা প্রকাশ করবার জন্য। তিনি নিরপেক্ষ এবং স্বয়ং প্রকাশ স্বতন্ত্র। জগৎ কিন্তু আপেক্ষিক ও

পরতন্ত্র। কাজেই তার বিচার ক্ষেত্রে কার্য্য কারণের ঘটনা পারম্পার্য্য স্বভাবতঃই এসে পড়ে।

ব্রহ্ম ব্রহ্মই থাকেন—তিনি জগৎ হন না। এ শুধু মায়ার অধ্যাস—বা ব্রহ্মজ্ঞান বলতে যে. 'ব্রহ্মকে জানা' এ ধারণাও ভুল। কারণ যে মন বুদ্ধি নিয়ে মানুষ কোন বস্তুকে জানে সে মন বুদ্ধি সসীম এবং তার অন্তর্গত যে বস্তুই হোক তারও ধর্ম্ম হবে সসীমত্ব। ব্রহ্ম কিন্তু অসীম। তবে কি তিনি অজ্ঞেয়? স্বামীপাদের মতে তিনি অজ্ঞেয়বাদীর অজ্ঞেয়ও নন আবার সসীম পদার্থের মত জ্ঞেয়ও নন। তাকে জানা জগৎ জানার চেয়ে আরো কিছু। সে জ্ঞানটা সসীম মনের জ্ঞান নয়। শ্রীঠাকুরের কথায়, মুখে বলা যায় না। এবং আরও গভীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে তাঁকে জানার ভেতর দিয়েই আমরা জগতকে জানছি। শ্রীঠাকুরের বাণীতেও আমরা পাই ঠিক এই বাণীরই পূর্ণ সংজ্ঞা। শুদ্ধ-মন শুদ্ধ-বুদ্ধি শুদ্ধ-আত্মা এক অর্থাৎ এখানে জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এই ত্রিপুটী এক এবং অখণ্ড। স্বামিজীর কথন-ভঙ্গীতে এই ভাবেরই অনুরনণ। বল্লেন স্বামিজী—জ্ঞান মানেই তো বিষয়ীকে বিষয় রূপে প্রত্যক্ষ করা। কিন্তু সাবজেক্ট তো তোমার মধ্যেই। আরও গভীরভাবে বলতে, তুমিই তো তিনি অর্থাৎ সেই বিষয়ী—তবে কেমন ক'রে তুমি নিজের ভেতর থেকে বাইরে এসে নিজেকে জানবে? ভুলে যেওনা—তাঁর সত্ত্বা নিয়েই তোমার সত্ত্বার অস্তিত্ব। তিনি তোমার অন্তর্নিহিত। তাঁকে ভুলে যাওয়া মানস স্মৃতির চিন্তার মত বাইরের কল্পনার ছবিতে টেনে আনতে পার না। বেদান্তের তত্ত্বমসি, ছান্দোগ্যের শ্বেতোকেতুর প্রতি উক্তি—স্মরণ কর। স য এষোঽপিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি

শ্বেতকেতো—স্বামিজীর এই কথার তাৎপর্য্য তাহ'লে এই বলা যায় যে ব্রহ্মকে জানা মানে ব্রহ্মস্বরূপ হওয়া।

বলেন স্বামিজী, অদ্বৈতবাদীর মতে ব্রহ্ম ছাড়া আর দ্বিতীয় কিছুই নাই। অথচ দেখা যাচ্ছে আমরা চোখের সামনে একটা দেশ-কালের-নিমিত্তের স্থূল অভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছি—সেটা তবে কি? দেশকালই বা কি? পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে এত যুক্ত যে এদের স্বতন্ত্র সত্ত্বা চিন্তা করাও যায় না অথচ এরই দ্বারা এক ব্রহ্মকে বহুরূপে প্রত্যক্ষ করছি। এরই নাম মায়া এবং মায়া ও ব্রহ্ম দুটি তত্ত্ব নয়। সত্য তত্ত্ব একটাই সেটী হচ্ছে ব্রহ্ম এবং বেদান্তে মায়ার সম্বন্ধে বলা হয়েছে সৎও নয় অসৎও নয় অনির্ব্বচনীয়—যেমন সমুদ্র আর তার তরঙ্গ। সমুদ্রের সঙ্গে তরঙ্গের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগে সমুদ্রেরই তরঙ্গ। শ্রীঠাকুরের বাণী,—যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। স্বামিজীও বলেছেন—প্রকৃতি সসীম বলতে এই বোঝায় যে, সে অসীমেরই একটি সীমাবদ্ধ ভাব তবে বেদান্তের মতে এই তরঙ্গ ক্ষণিক ও মিথ্যা—তাকে পরিত্যাগ করাই জীবের স্ব-স্বরূপ লাভ করা।

এই অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা শঙ্করাচার্য্য। লোকায়ত দর্শনের সুখবাদ যখন মানব সমাজকে চরম নাস্তিকতায় এনে পৌঁছে দিল তখন ঘটল বৌদ্ধধর্ম্মের নব জাগরণ। আবার তারও সহস্র বর্ষ পরে আবার যখন বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যেও হীনাচারের সৃষ্টি হয় তখনই শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈত বেদান্তের প্রতিষ্ঠা ক'রলেন। কাজেই এও একটা লক্ষণীয় বিষয় যে ধর্ম্ম ও সমাজ জাতির উন্নতি অবনতির উপর নির্ভর করে। এবং প্রাচীন ধর্ম্মও অনেক ক্ষেত্রে কতকাংশে পরিত্যজ্য হ'য়ে ওঠে, যদিও তারই ভিত্তিতে গঠিত হয় নূতন ধর্ম্ম। যাই হোক এই

বেদান্ত তত্ত্ব কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যথা বৈজ্ঞানিক বলবেন—জড়ই সমস্ত কিছুর মূল. বেদান্ত তাকেই বলবেন ব্রহ্ম।

স্বামিজী বললেন,আমি চাচ্ছি সাধারণ উপযোগী একটি ধর্ম্ম যাতে বুদ্ধের প্রেম, শঙ্করের জ্ঞান, আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রাচীন ধর্ম্মের সমস্তই অনুস্যূত থাকবে, সে হবে সম্মিলিত একটি কবিত্বপূর্ণ রূপ। প্লেটোতো বলেইছেন, কাব্যের মাধ্যমেও চরম সত্যের প্রকাশ হ'তে পারে। মনে করুন উপনিষদের একটি অমর কাব্য—

অগ্নি র্যথৈক ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥

আধুনিক বিজ্ঞানের উক্তিও তাই, সমস্তই একই শক্তির প্রকাশ। একজন অন্তঃপ্রকৃতির মাধ্যমে—এবং অপরজন বহিঃপ্রকৃতি অনুশীলনে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন। অদ্বৈতবাদ সকলকেই গ্রহণ করে কিন্তু তাই বলে কারও ওপর নিজের অধিকার স্থাপন করে না। সে শুধু সাহায্য করে মুক্তির পথে।

অবশ্য দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ পরস্পরের মধ্যে একটা বাদানুবাদ আছে। তবু উভয়েই জানেন, একজন ব্যষ্টিগত ব্রহ্মকে দেখছেন, আর একজন সমষ্টিরূপে। এবং উভয়েরই লক্ষ্য এক। দ্বৈতবাদী ঈশ্বর তার থেকে কিছু দূরে। অদ্বৈতবাদী সেই একই তত্ত্বকে আপন সত্বায় সত্বাময় বলে অনুভব ক'রবেন। কাজেই আমরাও চাই ধর্ম্মের একটি সার্ব্বজনীন রূপ। অনন্ত জ্ঞানের সঙ্গে অনন্ত প্রেমের ঘনীভূত একত্ব। এই মহাসম্মেলনই হবে এ যুগের পথ প্রদর্শক।

(ভ)

জগৎ প্রশ্নের আদি প্রশ্ন আমরা পাই বেদে। "যখন অস্তি নাস্তি কিছুই ছিল না তখন কি ছিল? স্বামিজী বল্লেন, এই প্রশ্ন থেকে আমরা বুঝতে পারি এমন একটা সময় ছিল যে সময় জগৎ বলে কোন বস্তু ছিল না এবং এরই পরবর্ত্তী প্রশ্ন, কে এই জগৎ সৃষ্টি ক'রল এবং কোথা হ'তেই বা এর উৎপত্তি? একটি উদাহরণ দেওয়া যায় যথা—গাছটি যখন দেখছি তখন তার একটি বীজ নিশ্চয় আছে এবং সেই বীজটীর মধ্যেই সুপ্ত ছিল বর্ত্তমান মহীরূহটী। এই উদাহরণ থেকেই আমরা বলতে পারি যে, প্রত্যেকটি সৃজনের মধ্যেই এমনি একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব এবং তার স্থূল প্রকাশের খেলাই আমরা দেখতে পাই। জগৎ সৃষ্টির মূলেও কতকগুলি সূক্ষ্ম উপাদান ছিল। সেই সূক্ষ্ম উপাদানের ঘনীভূত রূপই এই জগৎ। আবার সাংখ্য দর্শন বলেন, নাশঃ কারণ লয়ঃ অর্থাৎ সূক্ষ্ম থেকে যেমন স্থূলের অভিব্যক্তি তেমনি স্থূলের লয় হচ্ছে সূক্ষ্মে। কারণের প্রকাশ কার্য্যে আবার কার্য্যের বিশ্রাম কারণে। জগতের প্রতি অনু-পরমানুর মধ্যে কার্য্য কারণের এই ধারা চলছে। এবং কার্য্য ও কারণের মধ্যে একটি অভেদ সম্বন্ধ আছে। এই কার্য্য ও কারণের গতিচক্রে সমস্ত বিশ্বই একদিন কারণে লয় হবে এবং আবার কারণ অবস্থা থেকে হবে স্থূল বিশ্বের প্রকাশ—সুতরাং প্রলয় অবস্থাতে বিশ্বরূপ কার্য্য কারণেই সুপ্ত থাকে। কারণ শূন্য থেকে কখনও বিশ্বসৃষ্টি হ'তে পারে না। কিন্তু সময় প্রয়োজন, যেমন একটি বীজ থেকে বৃক্ষের উৎপত্তি কখনও এক মুহূর্ত্তে হয় না; অঙ্কুরের মধ্যে তার

কতকগুলি গুপ্ত ক্রিয়া হয়। তেমনি বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে সময়-টুকু স্থূল অভিব্যক্তি হ'তে প্রয়োজন সে সময় টুকুতে সূক্ষ্মে চলে তার প্রকাশ প্রস্তুতি। স্বামীপাদের উক্তিতে মনে হয় জগৎ সৃষ্টি প্রলয়ের মধ্যে তা'হলে তিনটী অবস্থা আমরা জানতে পারি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। শ্রীঠাকুরের বাণীতেও এই তিনটি কথার উল্লেখ পাই। অবশ্য শ্রীঠাকুরের বাণী আরও একটু গভীরে পৌঁছায়—কারণের পর মহাকারণ। এই স্থূল থেকে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম থেকে স্থূল অবস্থার পরিণতির মধ্যে চলে ক্রমবিকাশ ও ক্রমসঙ্কোচ। অবশ্য স্বামী-পাদের মতে আমরা দেখি যে ক্রমবিকাশবাদের সঙ্গে একটি জায়গায় হয়তো আমাদের মতানৈক্য ঘটতে পারে। আমরা বলি এই সৃষ্টির মূলে আছে চৈতন্যশক্তি কিন্তু তাঁদের মতে সৃষ্টির বহু পরে জগতে চৈতন্য সত্ত্বার আবির্ভাব। আমরা বলব একটি অখণ্ড প্রাণ প্রবাহ, যার আদি ও অন্ত এক—যদিও আমরা সেই প্রাণ প্রবাহের আদিতে দেখছি একটা প্রাণপঙ্ক (প্রোটোপ্লাজম) ও তার পূর্ণ পরিণতিতে দেখছি একটি পূর্ণাবয়ব মানবদেহ, যার মধ্যে একটি সুদীর্ঘ পার্থক্য ও ব্যবধান রয়েছে। তবু আমরা বলব এ সেই এক চৈতন্যেরই ক্রমবিকাশের পূর্ণ পরিণতি, ঐ বীজ ও বৃক্ষের মতই। স্বামিজীর কথার তাৎপর্য্য তা'হলে এই দাঁড়ায় যে, মানুষ যতই পূর্ণ হোক, আদি প্রাণপঙ্ক থেকে ক্রমবিকাশের পথেই তো তার পূর্ণ পরিণতি। কাজেই তার মধ্যে চেতন সত্ত্বা না থাকলে মানুষের ভেতর তা আসবে কেমন করে। যে বীজের মধ্যে বৃক্ষ উপাদানের শক্তি না থাকে তার থেকে বৃক্ষ হওয়া সম্ভব নয় এবং চৈতন্য যদি শেষ পরিণাম হয়, তবে পূর্ণ সৃষ্টি তো চৈতন্য থেকেই হতে হবে।

এবং ডিজাইন থিওরীতে পাই জগতের প্রতি বস্তুর মধ্যে একটি বৌদ্ধিক ক্রিয়া আছে।

স্বামিজী এখানে আনলেন—Law of conservation of energyর কথা—অর্থাৎ তুমি যন্ত্রে যতটুকু শক্তি প্রয়োগ ক'রবে সে তোমায় ততটুকু কাজই দেবে। তবে যখন তার প্রকাশ না থাকে তখন সে অব্যক্ত চৈতন্য এবং প্রকাশ কালে সে ব্যক্ত চৈতন্য। আর সর্ব্ব-সমষ্টি চৈতন্যকেই আমরা বলি ঈশ্বর—তাঁর সত্ত্বাতেই আমরা সত্ত্বাবান। সেই সমষ্টি চৈতন্যকে ঐ একটি নামে অভিহিত ক'রেছেন প্রাচীন মহামানবেরা এবং Law of association of ideas যদি মানতে হয় তা'হলে প্রাচীন হ'লেও তাঁকে ঐ নামেই আমরা অভিহিত ক'রব। কারণ একথা মানতে হবে যে সেই বিরাট চৈতন্যর ঐ নামের পিছনে আছে বহু যুগের ভাবধারা, সাধনা এবং পূজা, যার ফলে সে মহান শক্তির কোন প্রাকৃত নাম দেওয়া সম্ভব নয় এবং ঐ নামটির ভেতর আছে একটি সার্ব্বজনীনতা। ভারতীয় দর্শন বলে, যা কিছু দেখছি সবই সেই ঈশ্বরের প্রকাশ—অণুপরমাণু থেকে মহামানব পর্য্যন্ত। আবার তিনিই প্রলয় মুখে ক্রম-সঙ্কুচিত হ'তে হ'তে স্ব-স্বরূপে বিলীন হ'য়ে থাকেন।

——শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

(৭)

বিশ্বজগতের প্রশ্নের পর আর একটি জগতের প্রশ্ন আমাদের মনে স্বতঃই উদিত হয়, অবশ্য এ প্রশ্ন আসে সভ্যতার একটি

উন্নততম অবস্থায়। সে জগতের নাম স্বামিজী বললেন, অন্তর্জগৎ। বিশ্বের সমস্ত বস্তুর পশ্চাতে আছেন এক একজন অভিমানিনী দেবতা, এটি প্রাচীন শাস্ত্রকারদের উপলব্ধি-জাত সিদ্ধান্ত। তেমনি দেহের শেষ পরিণতির পেছনেও এমনি একটি সত্ত্বার অস্তিত্ব আছে কিনা—সেই প্রশ্ন থেকে গ'ড়ে উঠেছে আমাদের দেহগত অন্তর্জগতের বিশদ আলোচনা। কোন ইন্দ্রিয়ই স্বয়ং-ক্রিয় নয়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের পিছনে একটি ক'রে স্নায়ুকেন্দ্র আছে, যার অবস্থিতি মস্তিষ্কে। সেই স্নায়ুকেন্দ্রের পরিচালনাতেই ইন্দ্রিয় তা'র কাজ ক'রে যায়—তা'র বিকৃতিতে ইন্দ্রিয়ও বিকল হ'য়ে পড়ে। আবার তারও পেছনে আছে মন ও বুদ্ধি—সেগুলি কিন্তু স্থূলদেহের মধ্যে পড়ে না। সেগুলি সূক্ষ্মদেহের বিষয়—শ্রীঠাকুরও ব'লেছেন—মন, বুদ্ধি, চিত্ত নিয়ে সূক্ষ্মদেহ। কিন্তু মন ও বুদ্ধি যদি ইন্দ্রিয়ের কাজে যোগ না দেয় তবে ইন্দ্রিয়ের পক্ষে কোন কাজে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয় না। তবে এই সমস্ত কিছুর মূল হ'চ্ছে আত্মা—যে আত্মা অবিনাশী ও স্বয়ং-ক্রিয় এবং সে কারও সঙ্গে মিশ্রিত নয়। আত্মা সম্বন্ধে যে আমরা জ্ঞান লাভ করি সেটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত জ্ঞান, কারণ আত্মা স্বপ্রকাশ স্বসংবেদ্য—জ্ঞানস্বরূপ। সেই আত্মারূপ জ্ঞানের আলোতেই আমাদের চোখে স্থূলবস্তু হ'চ্ছে দৃশ্যমান—মন বুদ্ধি হ'চ্ছে উপলব্ধ। স্থূলদেহের বিনাশ আছে এবং এই দেহ মন কেউই নিজেই নিজেকে প্রকাশ ক'রতে পারে না। তা'দের প্রকাশের জন্য অনেক কিছুর প্রয়োজন। এবং জগদ্ব্যাপারও তা'দের ওপর অনেক প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু আত্মা এ সমস্তের ঊর্দ্ধে, কোন আলো আত্মাকে প্রকাশ ক'রতে পারে না। আত্মা

নিজেই জ্যোতি-স্বরূপ—দেহ মনের বিনাশ হ'লেও আত্মার কিছু এসে যায় না। কারণ তার অস্তিত্ব, সমস্ত অস্তিত্ব নিরপেক্ষ। তবে কি আত্মার উৎপত্তি শূন্য থেকে? কারণ প্রত্যেক অস্তিত্ববান সত্ত্বার তো একটি জন্ম কারণ আছে—কিন্তু আত্মার কেন নাই? তার উত্তর স্বামিজী দিলেন—আত্মার অবস্থিতি আবহমান কাল। কার্য্যকারণ তত্ত্বটী দেশ ও কালে নিবদ্ধ। সেই কার্য্যকারণ স্রষ্টা দেশ কাল তো আত্মার মধ্যেই বর্ত্তমান। স্বামীপাদের মতে আমাদের বিচার বুদ্ধিকে এইখানেই স্তব্ধ হ'তে হবে। কারণ দেশ-কাল নিবদ্ধ বুদ্ধি দেশ কালের অতীত বস্তুর বিচারে কোনদিনই সমর্থ হ'তে পারে না। বেদেও আমরা দেখি এখানে আর কোন কথা নাই। 'মৌনম ইত্যাচক্ষতে'। এখন প্রশ্ন আসে আত্মা যদি দেশ-কালের উর্দ্ধে তবে জন্ম-মৃত্যু পুনর্জন্ম এসব তবে কি? বা কার? স্বামীপাদের মতে আমরা যতটুকু জানতে পারি তা হচ্ছে এই, সেই বিরাট আত্মা দেশ-কালের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে নিজেকে এক একটা অবস্থার মধ্যে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন—অণু থেকে মহা। স্ব: থেকে বিরাটে, ক্ষুদ্র থেকে ভূমায়। পুনর্জন্মবাদও এই কথারই সমর্থন করে এবং পূর্ব্বজন্মের স্মৃতিও যে সর্ব্বজ্ঞ আত্মার স্মরণে থাকে না—সেও এই মায়া-উপহিত চৈতন্যের জন্যই। যে মুহূর্ত্তে আত্মা তার স্ব-স্বরূপ ফিরে পাবে সেই মুহূর্ত্তেই তার দৃষ্টিতে জগৎ ভ্রম দূর হ'য়ে যাবে, বুঝতে পারবে জন্ম-জন্মান্তরের মাধ্যমে সে এতদিন একটা স্বপ্নের রাজ্যে বিচরণ ক'রছিল। এইবার স্বামিজী পুনর্জন্মবাদের একটু বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা করলেন। স্বামিজী বল্লেন—প্রত্যেক নূতন অনুভূতির পেছনে আছে পুরাণো অনুভূতির স্মৃতি। আমাদের

জানার তৃষ্ণা এই নূতনকে দেয় চিনিয়ে। শিশু তার চারপাশের জিনিষের সঙ্গে পূর্ব্বদৃষ্ট অনুভূতিকে মিলিয়ে নিতে নিতে একটি বুদ্ধিযুক্ত মানুষে পরিণত হয়। পুনর্জন্মবাদ যদি না থাকে তা'হলে এই অনুভূতি কোথায় সঞ্চিত থাকে? ইংরাজীতে যাকে Instinct বলে সেও এই সঞ্চিত সংস্কার—ছাড়া কিছুই নয়। আজ যেটি ইচ্ছাযুক্ত (volitional) কাজ কাল সেইটিই instinctএ পরিণত হচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞান এবং শাস্ত্র এখানে একমত এবং মানুষ পশু সকলের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। স্বামিজী তাঁর পুনর্জন্মবাদে হেরিডিটিকেও স্থান দেননি এবং স্থান দেননি—অদৃষ্টবাদের দোহাই দিয়ে ভগবানের উপর দোষারোপ করার দাবীকে। বলেছেন প্রত্যেকেই আসে আপন আপন কর্ম্মসংস্কারের বোঝা সঙ্গে নিয়ে এবং সেই অনুপাতেই তাদের প্রকৃতি আচার ব্যবহার ইত্যাদি গড়ে ওঠে—পিতামাতার সংস্কার যদি সন্তানে সঞ্চারিত হয় তা'হলে বহু সন্তানের জনক-জননী তাঁদের নিজেদের মনকে সম্পূর্ণরূপে সংস্কার শূন্য বলেই অনুভব করবেন; কিন্তু সেটা সম্ভব নয় এবং অদৃষ্টের সুখ-দুঃখের ভোগকেও আমাদের পূর্ব্ব কর্ম্মজাত ফল বলেই ধরে নিতে হবে—ভগবানের ওপর দোষারোপ করা দুর্ব্বলতা। আমাদের প্রত্যেককেই এ দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করতে হবে—মনকে সংস্কার মুক্ত করবার জন্য নৈতিকতার পথে, পবিত্রতার পথে, ধর্ম্মের পথে এগিয়ে যেতে হবে। এবং একদিন না একদিন আমরা আমাদের মুক্ত সত্ত্বাকে ফিরে পাবই।

বহুত্বে একত্ব এই তত্ত্বটি আলোচনা কালে স্বামিজী বল্লেন প্রাচীন শাস্ত্র মতে পরম-বস্তু আমাদের মধ্যে এবং তিনিই প্রত্যগাত্মা। সূর্য্য যেমন কিরণ জাল বিকীরণ করে তেমনি মন, শরীর, ইন্দ্রিয় সেই আত্মারই এক একটি কিরণ—অর্থাৎ একেরই বহুরূপে প্রকাশ কিন্তু বহুর মাঝে একত্বের অনুসন্ধান বৃথা, যদিও বৈদিক ঋষিরা বহুর অনুশীলন ক'রতে ক'রতেই পেয়েছিলেন সেই পরম একের আভাষ লক্ষণ। কিন্তু তাঁদেরও দৃষ্টি ফেরাতে হ'য়েছিল অন্তর অভিমুখে উপনিষদ বলেন—মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি—অথচ সেই একই বহু হ'য়েছেন। তবু যদি আমরা তাঁর বহুত্বকে স্বরূপ বলে ধরেনি তবে মৃত্যুর পর আমরা অমৃতত্ব পাব না—পাব মৃত্যু।

প্রথমে মানুষ মনে ক'রেছিল স্বর্গ বলে যে স্থানটি তাদের অনুভূতিতে ধরা দিয়েছে সেইটিই বুঝি মিলিয়ে দেবে মুক্তির আনন্দ। কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী যত পরিবর্ত্তিত এবং উন্নত হ'তে লাগল ততই মানুষের বুদ্ধিতে এক একটি নূতন তত্ত্বের আলোকপাত হ'তে সুরু ক'রল—যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ—অর্থাৎ এখানে যা আছে সেখানেও তাই এবং সেখানে যা আছে এখানেও তাই। স্বর্গ যদি একটি স্থান বিশেষ হয় তবে তা দেশকালে আবদ্ধ। আর তা'হলেই ভৌতিক জগতের যা কিছু আছে অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু সবই তা'হলে সেখানেও আছে। কাজেই স্বর্গ লাভ আর মুক্তি লাভ এক নয়। বহুত্ব মিথ্যা—এ সম্বন্ধে স্বামিজী আরও বল্লেন, এ জগৎ বিপরীত ভাবসম্পন্ন বহুত্বেই পরিপূর্ণ। কিন্তু বাস্তবিক কি তারা

পরস্পর বিপরীতভাব যুক্ত ? যথা সুখ, দুঃখ, ভাল, মন্দ, সর্ব্বোপরি জীবন ও মৃত্যু ? স্বামিজী বল্লেন—তারা একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ এবং তাদের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা ডিগ্রির তফাৎ, সম্পূর্ণ বিপরীত তারা নয়। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগতে ভাল মন্দ দুই থাকলেও এর পেছনে একটি সত্ত্বা নিশ্চয় আছে—তাকে জানলে তবে তুমি প্রকৃত আনন্দের অধিকারী হবে। কিন্তু তার আগে তোমাকে পরিপূর্ণভাবে বিচারশীল হ'তে হবে, যার ফলে তুমি জানতে পারবে তোমার এক অনন্ত সত্ত্বাই সত্য। তুমি সাধ ক'রে অন্ধ সেজে অদৃষ্টের ওপর দোষা-রোপ ক'রছো। কিন্তু সত্য-সত্যই তুমি জ্যোতিস্বরূপ এবং বহুরূপে যা তোমার দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হ'চ্ছে তা জলের বুদবুদের মত ক্ষণিকেই মিলিয়ে যাবে। অগ্নির্যথৈক ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতি রূপো বভুব একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতি রূপো বহিশ্চ। ভুবনে প্রবিষ্ট অগ্নি যেমন দাহ্য বস্তুর রূপভেদে বহু, তেমনি আত্মা বস্তুভেদে বহু হ'য়েছেন। এ সমস্তই তুমি জানতে পারবে—শুধু বহুকে পরিত্যাগ ক'রে একের অভিমুখে অগ্রসর হও। শ্রীঠাকুর বলেছেন, এক জ্ঞানই জ্ঞান। এই সর্ব্বভূতে একত্বের দর্শনই চরম। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, আত্মাই সুখ দুঃখের ভোক্তা কিন্তু সর্ব্বলোকের চক্ষুর স্বরূপ সূর্য্য যেমন বাহ্যদৃষ্টির অশুচি দর্শনে অশুদ্ধ হন না তেমনি আত্মাও নিত্য নির্লেপ।

স্বামিজী বল্লেন, স্বর্গ, ইন্দ্রলোক, বরুণলোক, পিতৃলোক, চন্দ্রলোক, কোথাও তাঁকে পাওয়া যাবে না—কারণ উপনিষদ বলেন, ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নি তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

অর্থাৎ তাঁকে কেউই প্রকাশ ক'রতে পারে না। তিনিই সকলকে প্রকাশিত ক'রছেন এবং তাঁকে দর্শন ক'রতে কোথাও যাবার প্রয়োজন নাই---আত্ম-দর্শন, আত্মজ্ঞানেই ব্রহ্ম দর্শন বা ব্রহ্মজ্ঞান।

---

(৯)

স্বামিজী বল্লেন, এ জগৎ দুঃখপূর্ণ তার সঙ্গে এ জীবনের দুঃখও চিরন্তন। এ বোধ প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই আছে, অথচ এই জগতে এই জীবন নিয়েই আমাদের বাঁচতে হবে। তবে কি আমাদের দুঃখ মুক্তির কোন উপায়ই নাই, কারণ প্রত্যেক ধর্ম্মেই তো আমরা শুনে থাকি দুঃখের অতীত যে বস্তু এবং যিনি আনন্দময় একমাত্র তাঁকে পেলেই আমরা দুঃখ থেকে মুক্তি পাব এবং সেই আনন্দসত্ত্বা আছে জগতের উর্দ্ধে একটি অনির্বচনীয় লোকে। প্রাচীন শাস্ত্রের মতে তবে আমাদের প্রত্যেকের আত্মহত্যা করাই উত্তম এই রকমই মনে হয়, কিন্তু বিচার বুদ্ধিকে একটু সজাগ ক'রে দেখলে বোঝা যাবে, এই যে জীবন বা জগৎ বলতে আমরা যেটাকে দেখছি বা বুঝছি, সেইটাই সব বোঝা বা সব দেখা নয়। তাই জগৎ ত্যাগ বা সংসার ত্যাগের অর্থ হচ্ছে আমাদের দৃষ্টির মোহ আবরণ ত্যাগ। উপনিষদের ঋষি কণ্ঠে যে বাণী ধ্বনিত হ'য়েছে আমরা তার অনু-সরণ ক'রলেই বুঝতে পারব—তাঁরা বলেছেন—ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। এই কথাটিকে সম্যক উপলব্ধি ক'রতে হবে—এটিকে প্র্যাক্‌টিক্যাল কাজে লাগাতে অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে জগতকে দেখতে হবে। শ্রীঠাকুরের বাণী—মোড় ফিরিয়ে দাও।

পুত্র কলত্র সবই তোমার চারপাশে থাক ক্ষতি নাই। কাউকে পরিত্যাগ ক'রতে হবে না তোমাকে; বনে জঙ্গলে কোথাও যেতে হবে না। তুমি শুধু দৃষ্টির বিভ্রমটুকু সরিয়ে দাও, দেখতে চেষ্টা করো সবের ভেতর ঈশ্বরকে। তিনিই সর্বভূতে সর্বরূপে। বেদান্ত সেই উপদেশই দিয়ে থাকে সকলকে। ঈশামসি বলেছেন, স্বর্গরাজ্য তোমার ভেতরই। তুমি শুধু তোমার দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিবর্ত্তিত করো। বাসনা পরিত্যাগ অর্থে এ নয় যে বাসনাযুক্ত দেহটার বিনাশ সাধন করা। এখানেও উপনিষদের কথা স্মরণ ক'রতে আমরা বাধ্য— "এ ধন কারও নয়, সমস্তই তো ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত।" সুতরাং তোমার বিলাস বস্তু, অর্থ সম্পদ সবই তাঁর দ্বারা আবৃত এই ভাব যথার্থ উপলব্ধি যদি ক'রতে পার তবে তো দুঃখ ব'লে আর কিছুই থাকে না। স্বামিজীর এই কথায় মনে পড়ে শ্রীঠাকুরের বাণী— চিদানন্দ আরোপ কর, তোমাদেরও আনন্দ হবে। চিদানন্দ আছেই কেবল আবরণ ও বিক্ষেপ। সমন্বয়-ধর্ম্মী শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শকেই যেন বিবেকানন্দ ধ'রে দিলেন বেদান্তের মাধ্যমে, যা হ'ল বেদান্তের নূতন ভাষ্য। বল্লেন স্বামিজী—আর দুঃখকেও তো তুচ্ছ করবার উপায় নাই, সুখ যেমন মানুষকে ভোগ সম্পদে ক'রে তোলে সমৃদ্ধ, তেমনি দুঃখও এনে দেয় তার জীবনে শিক্ষার সম্পদ। তার কাছে মানুষ অনেক কিছু শিখতে পারে। একটা জড়পদার্থের দুঃখ বোধ নাই কিন্তু তার উন্নতিও নাই। মানুষের সুখ দুঃখই মানুষকে জড় থেকে পৃথক করেছে এবং ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে তাকে নিয়ে চলেছে একটা মহান পরিণতির পথে। স্বামিজী বল্লেন—আমাদের নিকটেই আনন্দময় জগৎ র'য়েছে কিন্তু আমাদের বাসনা-মলিন বুদ্ধিই তাকে

আবৃত ক'রে রেখেছে এবং মানুষ বাস ক'রছে আসুরিক জগতে। জগতকে যদি আনন্দময়রূপে সত্যিকার সম্ভোগ করতে চাও তবে বাসনা-বুদ্ধি ত্যাগ করতে হবে, বলতে হবে উপনিষদের ভাষায় 'হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্'—তত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে। বাসনা ত্যাগ করলে বুঝতে পারবে সেই অনাদি কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য এই জগৎ, তাঁরই আনন্দ সত্তায় পরিপূর্ণ—আর তার রস-ভোক্তা তুমি। অনেক সময় শোনা যায় কামনা বাসনা ত্যাগ করলে কর্ম্মপ্রবৃত্তি থাকবে কিনা? স্বামিজী বল্লেন—নিষ্কাম নিঃস্বার্থপর ব্যক্তির দ্বারাই ঠিক ঠিক কাজ হয় এবং সেইটিই হয় কল্যাণজনক কাজ। সমগ্র বস্তুতে, সমগ্র কর্ম্মে ঈশ্বর বুদ্ধি করলে কর্ম্মফলেও আর তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তোমাকে বন্ধনযুক্ত করতে পারবে না। তবে এও ঠিক জগতের নানা ঘাতপ্রতিঘাতে এই উচ্চতর ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু তারও উত্তর আছে—তা হল অভ্যাস যোগ অর্থাৎ সাধনা—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো, মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" —শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের সাধনায় আমাদের সেই সুদূর আদর্শে পৌঁছাতে হবে। প্রথম পদক্ষেপে সফলতা যদি না ও আসে বিফলতার মধ্যেই তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে। এবং মনে রাখতে হবে এই স্থিরবদ্ধ আদর্শই তোমার একমাত্র কাম্য এবং এইটিই চরম পাওয়া। উপনিষদ বলেছেন—তিনি দূরে, তিনি নিকটে, তিনি সকলের ভিতরে আবার সকলের বাহিরে—তাঁকে যাঁরা সর্ব্বভূতে দর্শন করেন তাঁর কাছে সর্ব্বভূত আত্মস্বরূপ হয়ে যায়। তাঁর শোকও থাকে না, মোহও থাকে না। এই অবস্থা লাভই

বেদান্তের বেদ্য লাভ। বহুত্বের ধারণাই মানুষকে ভ্রমে পতিত করে, দুঃখ শোকের সৃষ্টি করে, হিংসা বিদ্বেষে জর্জরিত করে—আর যিনি একদর্শী তিনি রোগ শোক জরা মৃত্যুর অতীত লোকের সন্ধান পেয়েছেন। কোন দুঃখই তাঁকে বিচলিত করতে পারে না, কারণ কার জন্য তিনি দুঃখ, কার জন্যই বা শোক করবেন? তাঁর কাছে তো সবই ব্রহ্মময়, তখন তাঁর উক্তি—

সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং
তত্তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥

শ্রীঠাকুরের কথায়—তুমিই আমি, আমিই তুমি।

---

(১০)

বর্তমান অধ্যায়ে স্বামিজী আনলেন অপরোক্ষানুভূতির কথা—আলোচনার প্রথমাংশে যে প্রশ্নের অবতারণা স্বামিজী করেছেন, তার অনেক অংশই পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে—অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টির মূল কোথায়? স্বামিজী বল্লেন—জগৎ সৃষ্টির মূলে যে বস্তু আছে সে বস্তু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়, কারণ ইন্দ্রিয় সসীম এবং বহু—শুধু তাই নয় বিভিন্ন বিভিন্ন মানুষ পশুর আছে বিভিন্ন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী। এক্ষেত্রে সেই চরম বস্তুর একটি পূর্ণাঙ্গ সার্ব্বিক ধারণা হওয়া কঠিন। তাই মহাপুরুষেরা বল্লেন—অন্তরের গভীরতম প্রদেশে আত্মতত্ত্বেই আছে এর পূর্ণাঙ্গ মীমাংসা এবং এই আত্মতত্ত্ব অপরো-

ক্ষানুভূতির বিষয়। বৈদিক জ্ঞানভিক্ষু নচিকেতার প্রশ্নের উত্তরে যম বলেছিলেন—প্রেয় ও শ্রেয় এই দুটির মধ্যে যে শ্রেয়কে গ্রহণ করে তার কল্যাণ হয়। আর যারা প্রেয়কে গ্রহণ করে তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

শ্রেয় প্রেয় দুই-ই মানুষের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে—কিন্তু বাসনা একটি মূল বাধা—যে. শ্রেয়কে গ্রহণ করতে দিচ্ছে না—গ্রহণ করাচ্ছে প্রেয়কে। এইখানে স্বামিজী আনলেন গুরুবাদ—তিনি জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় শিষ্যের বাসনা-মলিন অজ্ঞান অন্ধকারকে বিদ্ধ ক'রে জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করে দেবেন। বল্লেন স্বামিজী, গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই যোগ্যতা থাকা দরকার। উপদেশ দান ও গ্রহণের ব্যাপারে শিষ্যকে বিনা তর্কে অর্থাৎ বৃথা তর্ক পরিত্যাগ ক'রে বুঝতে হবে, ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয়, তর্কের বিষয় নয়। পূর্ব্বসূরীদের উপলব্ধির বিষয়গুলি পরে যুক্তি হয়ে দাঁড়ায় এবং গুরু সেইগুলিই তুলে ধরেন শিষ্যের সম্মুখে। সুতরাং বিশ্বাস যত অন্ধই হোক তার প্রয়োজন আছে। স্বামিজীর এই কথা কি শ্রীঠাকুরের কথারই প্রতিধ্বনি? শ্রীঠাকুরও একদিন বলেছিলেন স্বামিজীকে, বিশ্বাসের খানিকটা চোখ খোলা, খানিকটা অন্ধ—সে আবার কি? বিশ্বাসের সবটাই তো অন্ধ। আরো বলেছেন—বিশ্বাস যত বাড়বে জ্ঞানও তত বাড়বে। স্বামিজী বল্লেন—তাই বলে এটুকু মনে রেখো যে কোন মহাপুরুষই তোমাকে বলবে না নিজে প্রত্যক্ষ না করে কেবল মাত্র বিশ্বাসের দায়ে অস্পষ্ট একটা ধারণা নিয়ে বসে থাকতে। অপরোক্ষানুভূতির ইচ্ছা আমাদের নিত্য জাগিয়ে রাখতে হবে। অনুভূতি বিহীন ধার্ম্মিক আর অজ্ঞ বাস্তববাদী উভয়েই আমার দৃষ্টিতে সমান। কিন্তু

আমাদের ধর্ম্ম এখন বিচারমূলক তত্ত্বে পর্য্যবসিত হয়ে গেছে। যে যত বাগ্মী সে ততবড় ধার্ম্মিক। কিন্তু মুখে নীতিবাক্য আওড়ানো আর নৈতিক জীবন পালন দু'টোর মধ্যে পার্থক্য অনেক এবং প্রত্যক্ষানুভূতিই পারে আমাদিকে সত্যিকার নীতি-পরায়ণ ক'রে গ'ড়ে তুলতে। লক্ষ লক্ষ ধর্ম্ম-বৈচারিকদের ভেতর একজন অপরোক্ষানুভূতিযুক্ত সাধক থাকুক—পৃথিবী ধন্য হ'য়ে যাবে। স্বামিজী বল্লেন—অপরোক্ষানুভূতি না হ'লে পূর্ণ বিশ্বাসও সম্ভব নয়, যদিও সে অনুভূতি হওয়া কথার কথা নয়। কারণ সে অনুভূতির আনন্দ এই ঐহিক আনন্দের সঙ্গে কোন ক্রমেই তুলনীয় নয়, সে আনন্দের কোন পরিবর্ত্তন নাই—তবু এই প্রত্যক্ষানুভূতি হওয়া খুবই কঠিন। কিন্তু একবার এই অনুভূতি হ'লে কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হ'লেও তোমার বিশ্বাস অটল থাকবে—কারণ যা তুমি পেয়েছ তা তোমার অন্তরের অনুভূতির সঙ্গে একীভূত হ'য়ে গেছে।

এই অনুভূতি লাভ ক'রতে হ'লে জাগতিক সুখ দুঃখ সবই তোমায় ত্যাগ ক'রতে হবে। জগতের সমস্ত তপস্যার অনুষ্ঠান সেই পরম প্রাপ্তির আশায়। তাঁকে লাভ ক'রবার জন্য এ লোকে ব্রহ্মচর্য্যে স্থিত হয়। বেদে তাঁর তটস্থ লক্ষণ দিয়েছে যে ওঁকার, নচিকেতার প্রতি যমের উপদেশের মাঝে যার ব্যাখ্যা আমরা পাই—অজর, অমর, শ্বাশ্বত, পুরাণ, সদা চৈতন্যময়—তাঁকে জানতে হ'লে তোমাকেও শাস্ত্র সম্মতভাবে সাধন অনুষ্ঠান ক'রতে হবে। এবং তখনই হবে তোমার প্রত্যক্ষানুভূতি—তখন তোমার কাছে জগতের আনন্দ আর ব্রহ্মানন্দে কোন প্রভেদ থাকবে না। তুমি

পূর্ণ প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে অনুভব ক'রবে তিনি অণু হ'তেও অণু, মহান্ হ'তেও মহীয়ান। সমগ্র বিশ্বই তোমার চোখে ব্রহ্মময় হ'য়ে যাবে। তাই উপনিষদের ভেতর প্রধান কথা অপরোক্ষানুভূতি। কিন্তু তার্কিক অসংযত ব্যক্তির কাছে এ তত্ত্ব অপ্রকাশিত। উপনিষদে ব'লেছেন যে রথে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ দৃঢ়ভাবে সংযত না থাকে, মন রূপ রজ্জুও যার অসংযত, সে রথ অবশ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হয়—যতদিন আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বদ্ধ থাকব ততদিন এই পূর্ণতা লাভ সম্ভব নয়। এমন দিন আসবে যেদিন এ কথাটি আমরা সম্যক উপলব্ধি ক'রতে পারব। তখনই আমাদের জাগবে একটা তীব্র প্রচেষ্টা এই মায়াজাল হ'তে বিমুক্ত হবার। তখনই আমাদের জীবনে সুরু হবে বৈরাগ্যের জয়যাত্রা সেই বিরাট শক্তির অভিমুখে। যে বিরাট শক্তি হ'য়েছেন ক্ষুদ্র, যে বিরাট মহান্ হ'য়েছেন অণু—সেই অনন্তের পথে আমাদের হবে পরম-যাত্রা, যাঁর থেকেই এই ভোগমুখী জগতের উৎপত্তি—আবার লয়-মুখে, ক্রম-সঙ্কোচ পদ্ধতিতে, ত্যাগই হবে আমাদের জীবন পদ্ধতি। এবং তার মূল মন্ত্র হবে সেই বিরাটের শরণ মন্ত্র—নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু।

কর্ম্মযোগ

কৃ ধাতু থেকে কর্ম্ম। কর্ম্ম বলতে কর্ম্ম বা কর্ম্মফলকেও বোঝায়—দর্শনে কখনও বা পূর্ব্বকর্ম্মের সংস্কার বা ফলই বর্ত্তমান কর্ম্ম বলে ব্যাখ্যাত। কর্ম্মযোগে কিন্তু সব কাজই কর্ম্ম বলে গৃহীত হয়েছে। সাধারণের ধারণা সুখ লাভই বড় কথা। কিন্তু সুখ অতি ভঙ্গুর--জ্ঞানই জীবনের চরম লক্ষ্য এবং এই জ্ঞানের লাভে শুধু সুখই লক্ষ্য নয়—দুঃখও মহান্ শিক্ষক। সুখ-দুঃখের সংঘাতেই মানব-চরিত্র গঠিত হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়—দুঃখ সংঘাতই ব্যক্তিত্ব স্ফুরণে সহায়ক।

এই জ্ঞান আবার আভ্যন্তরীণ। আমাদের আত্মার আবরণ যতই অপসারিত হয় আমরা ততই জ্ঞানলাভ করি—বহির্জগত কেবল উদ্বোধক সৃষ্টি করে মাত্র। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার, আপেলের পতনে মনের ভিতরে জ্ঞানের উপকরণ-গুলিকে শৃঙ্খলিত করলো মাত্র—ওটি পৃথিবী কেন্দ্রে বা আপেলে ছিল না। অতএব পারমার্থিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান সমস্ত মানুষের মনে। মনের আবরণ সম্পূর্ণ সরে গেলে মানুষ সর্ব্বজ্ঞ হয়ে যায়—চকমকিতে অদৃশ্য অগ্নি ঘর্ষণে প্রজ্জ্বলিত হওয়ার ন্যায় সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না প্রভৃতি বিপরীত সংঘাতেই চরিত্র গঠিত হয়, আভ্যন্তরীণ জ্ঞান দপ করে প্রকাশিত হয়। আমরা যা কিছু করি তাই কর্ম্ম এবং সংবিত্তি রেখে যায় মনে—বর্ত্তমান চরিত্র গঠন করে।

ক্ষুদ্র বস্তু লক্ষ্য হয় না কিন্তু সমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ সমষ্টিই একত্রে ভয়ানক শব্দ সৃষ্টি করে। সেইরূপ কোন ব্যক্তির চরিত্র পর্য্যালোচনাও ক্ষুদ্র কার্য্যের ওপরেই করতে হয়—কেন না সময় সময় নির্ব্বোধও বীরতুল্য কাজ করে। কিন্তু মহৎ জীবন জানতে গেলে সকল অবস্থাতেই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারেও যার মহত্ত্ব ফুটে ওঠে, জানতে হবে তিনিই মহৎ।

যত রকম শক্তি নিয়ে মানুষ চলে তার মধ্যে কর্ম্মশক্তিই প্রবল এবং চরিত্র গঠনে যে কর্ম্ম সহায়ক সেইটিই প্রবল শক্তি। শ্রেষ্ঠ মানুষের কর্ম্ম-শক্তিতে গ্রহণ-শক্তি ও প্রক্ষেপ-শক্তি দুইই প্রবল।

জগতে যা কিছু সৃষ্টি বা আবিষ্কার ইচ্ছারই বিকাশ মাত্র—আবার এই ইচ্ছাই চরিত্র গঠন করে এবং চরিত্র কর্ম্মগঠিত মাত্র। জগতে সর্ব্বাপেক্ষা ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিই সবচেয়ে মহাপুরুষ ও বড় কর্ম্মী। এবং এটী আত্মিকশক্তি। যীশু, বুদ্ধ এদের কর্ম্মশক্তি জগৎকে নাড়া দেওয়ার মত কিন্তু পিতার কাছে পাওয়া নয়। যুগ যুগ ধরে ওই শক্তি ওই সত্বারই মধ্যে সঞ্চিত ছিল এবং প্রবলতর রূপে জগতে যীশু ও বুদ্ধ রূপ ধরলো। সেই শক্তির আবর্ত্ত আজও চলছে।

সমস্তই কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত। বিনা কর্ম্মচেষ্টায় ফাঁকির দ্বারা মহৎ লাভ হয় না। একজন লোক সারাজীবনে বৈধঅবৈধ নানা উপায়ে প্রচুর ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ করতে পারে কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মের দ্বারা উপার্জ্জিত না হলে তখন ঘৃণ্য বলেই প্রতিপন্ন হবে—তদ্ব্যতিরেকে সে যতটুকু ভোগের যোগ্য ততটুকুই ভোগ

করতে পারবে, অধিক নয়। মূর্খ চেষ্টার দ্বারা অনেক পুস্তক সংগ্রহ করলেও সবগুলি তার বোধগম্য হয় না, ফলে কর্ম্ম কার্য্যকরী হয় না। কাজেই এসব ক্ষেত্রে গীতার মত 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্' কথার আদর্শ নিতে হবে। অল্প সময়ে কৌশলের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধির উপায়ই কর্ম্মযোগ। তজ্জন্য মানুষকে দেখতে হবে অতীতের কর্ম্মই যদি মানুষের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য দায়ী হয় তবে ভবিষ্যতে আমরা যা হতে চাই প্রস্তুতির জন্য বর্ত্তমানে তদনুযায়ী চেষ্টা রাখাই কর্ম্মযোগের কৌশল। মানুষের আত্মা অনন্ত শক্তির আধার। নানান্ কর্ম্মপ্রচেষ্টার দ্বারা সেই সেই শক্তির জাগরণই সমুদয় কর্ম্মের উদ্দেশ্য।

বেশীর ভাগ মানুষই কোন নির্দ্দিষ্ট আকাঙ্খা নিয়ে কাজ করে। কারো উদ্দেশ্য যশলাভ, কারো অর্থ, কারো বা প্রভুত্ব — আবার কারো বা স্বর্গ কামনাই প্রধান। চীন প্রভৃতি দেশে মৃত্যুর পর নাম রাখার জন্য কাজ করে। কেহ বা প্রায়শ্চিত্ত মানসে কাজ ক'রে থাকে—সারা জীবনে অসৎ কার্য্যের পর মন্দির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। অতএব অভিসন্ধিই কার্য্য-প্রবৃত্তির নিয়ামক।

কিন্তু অভিসন্ধি ব্যতীত কাজ করেন এমন একদল লোকও জগতে আছেন। যাঁরা স্বর্গসুখ, নাম যশ, অর্থ কোন অভীপ্সা নিয়েই কাজ করেন না—তাদের কাজ শুধু পরোপকারার্থে। সৎকাজ করতে তারা ভালবাসেন বলেই করে থাকেন। যারা কোন অভিসন্ধি নিয়ে কাজ করেন সব সময়ে তারা অতি কিছু ফললাভ করেন না—আবার নিঃস্বার্থপর হয়ে যারা কাজ করেন

তারা ক্ষতিগ্রস্ত হন তা নয়। বরং এতেই অধিক লাভ। কিন্তু এই স্বার্থগন্ধহীনভাবে—শাস্তির ভয় না রেখে কর্ম্ম করা, অতি কঠিন এবং যারা করেন তারা মহাপুরুষ। কিন্তু মনে রাখতে হবে পাহাড়ী পথে অশ্বের রাশ ছেড়ে দেওয়া অপেক্ষা রাশ টেনে চালানই শক্তিমত্তার পরিচয়। মানুষ সামান্য লাভের আশায় যে কোন পন্থা অবলম্বন করে। কিন্তু সে জানে না যে সংযমই মহতী শক্তির স্রষ্টা। সংযম উৎপন্ন শক্তি কালে জগৎ চালনায় সক্ষম হয়। সংযম গঠিত চরিত্র ভবিষ্যতে ইচ্ছাশক্তিতে লক্ষ টাকাও লাভে সমর্থ হয়।

কোন কর্ম্মই ঘৃণার্হ নয়। ফলের দিকে লক্ষ্য না রেখে কাজ করাই কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্য। গীতার 'মা ফলেষু কদাচন' আদর্শের সঙ্গে স্বামিপাদের উপদেশের মিল রয়েছে। কিন্তু যে ফলাকাঙ্খা ব্যতীত কাজে অক্ষম, সে অভিসন্ধি নিয়ে কাজ করুক, কি সেই অভিসন্ধিগুলিকে বজায় রেখে কাজ করুক—প্রতিফলের আশা না রেখে কাজই কর্ম্মের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

প্রকৃত কর্ম্মযোগী গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে তীব্র কর্ম্মী। আবার ভীষণ কর্ম্মচাঞ্চল্যের মধ্যে হিমালয়ের মত স্তব্ধীভূত। কর্ম্মযোগীর এই রহস্য জেনে চললে অচিরেই আমাদের কর্ম্ম-বন্ধন থেকে ঘটবে মুক্তি।

কিন্তু এই মুক্তির জন্য চাই সুরু থেকে নিঃস্বার্থপরতার প্রস্তুতি—যতটুকু পারা যায় ততটুকুই অভ্যাস করতে করতে আমরা একদিন সত্যিই নিঃস্বার্থপর হ'তে সক্ষম হব। স্বার্থহীন কর্ম্মযোগের অধ্যবসায় অবশেষে আমাদের আভ্যন্তরীণ জ্ঞানকে জাগ্রত করবে।

(২)

স্ব স্ব কার্য্যক্ষেত্রে কেহই ছোট নহে

এই সৃষ্ট জগতে পশু, উদ্ভিদ্, মানুষ সকলেই সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণের উপাদানে পরিচালিত। প্রত্যেকের মধ্যেই কখনও কোন গুণের আধিক্য হয়, কখনও আবার কোন গুণের নিস্তেজ ভাব আসে। তমো গুণে আলস্য আনে, রজো গুণে চাঞ্চল্য ও সত্ত্বগুণে মনের শান্ত ভাব আনে। গীতার গুণত্রয়-বিভাগ-যোগের মিল আছে এখানে। স্বামিজী বলেন, এই তিন গুণের ব্যবহারের কৌশল শিক্ষাই কর্ম্মযোগ দেয়। কর্ম্মযোগ ভালরূপ কর্ম্মের শিক্ষা দেয় কিন্তু সৎকর্ম্মের একটা নির্দ্দিষ্ট মাপকাঠি ঠিক করা খুব কঠিন। এক-একটি আচার এক এক দেশে নীতিযুক্ত বলে বিবেচিত হ'লেও ঠিক সেই কথাই অপর দেশে একান্ত নৈতিকতা-হীন বলে বিবেচিত হয়। তাহ'লে সৎকর্ম্ম নির্দ্ধারণের উপায় কি? এখানে স্বামিজী বলেন, দেশ-কাল-পাত্র ভেদে কর্ত্তব্য কর্ম্মের, সদাচারের ক্রম ভিন্ন হলেও তার একটা সার্ব্বভৌম রূপ আছে— যে কাজে মানুষের অন্তরাত্মা আত্মগ্লানিতে ভ'রে উঠে আত্মা সঙ্কুচিত হয়, সে'টিই অন্যায়, পাপ এবং নাশের কারণ। অতএব জগৎবাসী সকলের প্রধান কর্ত্তব্য আপনার ওপর বিশ্বাস ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস। অন্যায়ের অপ্রতিকারেই যে পাপ হয় তাও নয়—আবার অপ্রতিকারই সব সময় আদর্শ, তাও নয়। আসলে লক্ষ্য করতে হবে প্রতিকারের সামর্থ্য বা প্রয়োজনীয়তা কতটুকু। অনেক ক্ষেত্রে অক্ষমতা আমাদের কর্ত্তব্য ভুলিয়ে দিয়ে মনে মনে ত্যাগের মিথ্যা অভিমান এনে দেয়—যেমনভাবে অর্জ্জুন

শত্রুসেনা দেখে যখন ভীত হয়ে তত্ত্বকথা ব'লে নিজেকে ত্যাগী প্রতিষ্ঠিত ক'রতে গিয়ে ভগবানের কাছে তিরস্কৃত হ'য়েছিলেন।

কর্ম্মযোগের আদর্শ অপ্রতিকার, সর্ব্বাবস্থায় সহনশীলতা এবং এইটীই সর্ব্বোচ্চ শক্তি বিকাশের সোপান। কিন্তু সর্ব্বোচ্চ আদর্শ পালনের আগে চাই প্রতিরোধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভের অসীম শক্তি—তবেই তুমি কর্ম্মযোগীর আদর্শ অপ্রতিকারে সমর্থ হবে।

এর পর জড়তুল্য অপদার্থ লোকের উদাহরণ দিয়ে ব'লেছেন যে, জড়পিণ্ড অবস্থা দূর করার জন্য মিথ্যা অন্যায় ইত্যাদির দ্বারাও কর্ম্ম-চঞ্চলতা ও ব্যক্তিত্বের উন্মিষন আনতে হবে। আসল কথা হচ্ছে চরম নিষ্ক্রিয় অবস্থা বা শান্তভাব লাভ করতে হলে সে'টি কর্ম্মশীলতার মধ্য দিয়েই করতে হবে। এখানে Dynamic পদ্ধতি গ্রহণ ক'রেছেন।

জড়তা, দীর্ঘসূত্রতা সর্ব্বদাই ত্যাজ্য। শাস্ত্র সদাচার বলে বটে—কাহাকেও ঘৃণা করিও না, ঐশ্বর্য্যকামী ঘৃণ্য ইত্যাদি—কিন্তু অন্তরে যতক্ষণ প্রতিকারের ইচ্ছা, ঐশ্বর্য্যের বাসনা ক্ষতের সৃষ্টি ক'রছে, ততক্ষণ পুরুষকারের দ্বারা সেগুলি যথাসাধ্য ভোগ ক'রে সত্যিকারের নিবৃত্তি আনাই ভালো। অন্তরে ভোগেচ্ছা প্রতিহিংসা পুষে মুখে ত্যাগ দেখানো কপটতা মাত্র। আর কপটাচারে কোন মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হয় না। আগে প্রচণ্ড চেষ্টার দ্বারা বাসনা মেটাও, তবেই ত্যাগ ও শান্তির অধিকারী হবে। পৃথিবীর অর্দ্ধাংশে কুড়িটী যথার্থ শান্ত প্রকৃতি ও অহিংসক আছে কি না সন্দেহ।

জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজ নিজ আদর্শ ভিন্ন এবং সেই লক্ষ্য রেখে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা উচিৎ। একে অপরের আদর্শ নকল ক'রে এগোতে পারে না। কোন সমাজের প্রত্যেকটি নরনারীর কখনও একরূপ মন বা বুঝবার একরূপ শক্তি সম্ভব নয়.। আপেল গাছকে বিচার করতে ওক গাছের আদর্শ নিলে চলবে না।

বহুত্বের মধ্যে একত্বই সৃষ্টির অন্তর্নিহিত রহস্য হ'লেও বিভিন্নতাই ব্যবহারিক বৈচিত্র্য। এই কারণে সকলের সম্মুখে এক আদর্শ ধরা কখনও উচিত নয়। প্রত্যেককে নিজের আদর্শ স্থানে উৎসাহিত করাই আমাদের উচিৎ। এজন্য হিন্দু ধর্ম্মনীতি চতুরাশ্রমে বিভিন্ন বিধি নির্দ্দিষ্ট এবং এগুলির কোনটী অন্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। গৃহী বা বা সন্ন্যাসী, রাজা বা ঝাড়ুদার কেহই কাহারো অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। বর্ত্তমানে গৃহী ও সন্ন্যাসী দুটী আশ্রমে পরিণত হয়েছে। স্বামিজী মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের আদর্শ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন স্ব স্ব আদর্শে প্রত্যেকেই শ্রেষ্ঠ—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র থেকে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে ব'লেছেন গৃহী ব্রহ্মনিষ্ঠ হবে এবং সমস্ত কর্ম্ম ব্রহ্মে আহুতির উদ্দেশ্যে করতে হবে। অতি হীন লোকও প্রশংসায় উত্তেজিত হয়ে মহান কাজ ক'রে ফেলতে পারে। কিন্তু এই যে সংসারীর আদর্শ, কেবল মাত্র ব্রহ্মমুখী হ'য়ে কাজ করা—প্রশংসা যশ লাভ ইত্যাদি কোন উদ্দেশ্যেই নয়, এটী কি কম কঠিন? গৃহী চৌর্য্য, মিথ্যা, প্রতারণা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করবেন না, মনে রাখতে হবে তার জীবন ঈশ্বর সেবা ও দীন সেবার জন্য। পিতা মাতা প্রত্যক্ষ দেবতা। তাদের তুষ্টিতেই পরব্রহ্ম তুষ্ট হন। মা-বাপের সামনে

ঔদ্ধত্য, পরিহাস, চঞ্চলতা, ক্রোধ, কটুবাক্য সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। মাতা-পিতা পুত্র পত্নী, ভ্রাতা ও অতিথি নারায়ণের ভোজনের অগ্রে ভোজন পাপ। পিতা-মাতা থেকে শরীর উৎপন্ন। অতএব শত কষ্টেও তাদের প্রীতিলাভ করাই উচিৎ। স্ত্রীর প্রতি গৃহীর কর্ত্তব্য আছে, সতীসাধ্বী স্ত্রীকে মাতৃবৎ পালন— শত কষ্টেও পরিত্যাগ না করা, পরস্ত্রীকে কলুষিত চিত্তে গ্রহণ না করা, নির্জনে তাদের সঙ্গে শয়ন বা বাস না করা, স্ত্রীলোকদের কাছে বাহাদুরী না দেখানো। পরন্তু নিজ স্ত্রীর প্রেম শ্রদ্ধা, ধন বস্ত্র, প্রিয়বাক্য ইত্যাদি দ্বারা সন্তোষ সাধন করা উচিৎ। পতিব্রতা স্ত্রীকে যিনি তুষ্ট রাখেন তার সমুদয় ধর্ম্ম আচরণ করা হয়েছে। প্রথমে পুত্র কন্যাদের লালন পালন, পরে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত নানাবিধ শিক্ষাদান, তৎপরে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত করণ—তারও পরে আত্মবৎ স্নেহ করা উচিৎ। এইরূপে কন্যাকেও লালন-পালনাদি করতঃ সৎপাত্রে সম্প্রদান করা উচিৎ।

গৃহী এইপ্রকারে আত্মীয় স্বজনের সন্তোষবিধান করতঃ গ্রামবাসী অতিথি ও উদাসীনের সেবায় মন দিবেন। বিভব থাকা সত্ত্বেও যে এগুলি করে না, সে সর্ব্বথা নিন্দনীয় ও পাপী। স্বামিজী আরও বলেছেন—গৃহী আহার, বাক্য, নিদ্রা, মৈথুন, বিলাস সব ব্যাপারেই হবেন মিতাচারী এবং অকপট, নম্র। শৌচসম্পন্ন উদ্যমশীল হবেন। শত্রুর সামনে বীর্য্যপ্রকাশ এবং গুরুজন সম্মুখে শান্তভাব অবলম্বন করতে হবে। অসৎকে পরিত্যাগ এবং এর মর্য্যাদাদান গৃহীর কর্ত্তব্য। লোকের প্রকৃতি প্রবৃত্তি জেনে তবে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন বা বিশ্বাস স্থাপন করবে। গৃহী নিজ যশ ও পৌরুষের বিষয়, কোন গুপ্তকথা এবং পরার্থে স্বকৃত উপকারের কথা কখনও

প্রকাশ করবেন না। গৃহস্থই সমাজের ভরণকর্ত্তা। কাজেই আত্মীয়দের জন্য, প্রতিবেশীর জন্য, সমাজের জন্য তার কাজ এমন হবে যাতে তার হৃদয়ে নিয়ত শক্তির বিকাশ ঘটে—যদি না হয়, বুঝতে হবে তিনি নিজ আদর্শের অনুযায়ী চলার চেষ্টা করছেন না। গৃহী যদি কোন কারণে অন্যায়ে লিপ্ত হন বা কোন কাজে অকৃতকার্য্য হবেন বুঝতে পারেন—সেকথাও লোকের কাছে প্রকাশ করবেন না। তার ফলে স্বকীয় দোষের ফলভোগ ছাড়াও লোকের নিন্দা-বাণী আত্মাকে অনেক নিরুৎসাহ এবং কলুষিত করবে। বরং পুনরায় যাতে ভালোভাবে চলা হয়, এজন্য চেষ্টা রাখতে হবে। গৃহী সর্ব্বদা বিদ্যা, ধন, যশ, ধর্ম্ম উপার্জ্জন করবে এবং ব্যসন, অসৎসঙ্গ, মিথ্যাবাক্য, পরহিংসা ত্যাগ করবে।

ধনলাভের চেষ্টাও গৃহীর নিন্দনীয় নয়—কেন না, তা না হ'লে মানব-সমাজের সভ্যতা, দরিদ্রালয়, অট্টালিকা কিছুই গড়ে উঠত না, জগৎটা তা'হলে প্রাগৈতিহাসিক যুগেই থেকে যেত। গৃহই সমাজের প্রাণকেন্দ্র। অতএব গৃহী সদুপায়ে উপার্জ্জন করবে এবং পরার্থে, সৎকার্য্যে সে'টা ব্যয় করবে। সন্ন্যাসীর নির্জ্জন সাধনে যেমন মুক্তিলাভ হয়, গৃহীরও উপরিলিখিত উপায়ে চলায় মুক্তি অবধারিত। অতএব সন্ন্যাসী ও গৃহী নিজ কর্ত্তব্য-পালনে কেহই নিকৃষ্ট নয়।

চেষ্টা অবস্থার এবং কাজ সময়ের অনুগত। কাজেকাজেই সেইমত কাজ করবে। গৃহস্থ ধীর, সত্য, মৃদু, প্রিয় ও হিতকর কথা বলবে এবং জনকল্যাণে জলাশয় খনন, বৃক্ষরোপণ, সেতু নির্ম্মাণ এবং অন্যান্য কল্যাণকর কর্ম্মানুষ্ঠানে গৃহী যেন

ত্রিভুবন জয়ী হ'য়ে থাকেন। যোগীগণ যে চরম পদ লাভ করেন, গৃহীও এই আদর্শে চ'লে সেই পথে এগিয়ে যান। আরও বলা যায়—যিনি যুদ্ধে অভী, সংগ্রামে যিনি অগ্রগামী, ধর্ম্মযুদ্ধে যিনি মৃত হন—তিনিও ত্রিভুবন জয় করেন। অতএব দেখা যাচ্ছে, শাস্ত্র ও সদাচার কোন কাজটিকেই নিন্দা করেন না। দেশ কাল পাত্র ভেদে তদুপযোগী কাজ করতে হবে। অতএব দেখা যাচ্ছে—দুর্ব্বল সর্ব্বথা ঘৃণ্য ও ত্যাজ্য। হিন্দুদর্শনের ধর্ম্ম-কর্ম্মের এই আদর্শটীকে স্বামিজী খুব প্রশংসা করেছেন। অতএব অভী হয়ে নিজ নিজ কর্ত্তব্য করে যাও—কেন না, ভয় বা দুর্ব্বলতা মানুষকে ভগবৎ পথ থেকে বিচ্যুত করে। পাপে লিপ্ত করে। এইটীই স্বামিজীর বাণী। সেজন্য সন্ন্যাসী যেন গার্হস্থ্য কর্ম্মকে ঘৃণা না করেন। অপর দিকে গৃহী যেন সর্ব্বত্যাগী ঈশ্বর ধ্যানে নিবিষ্ট সাধুকে অলস মনে না করেন। নিজ নিজ অধিকারে কেহই ছোট্ নয়। একটী গল্পের সাহায্যে স্বামিজী এই কথাটি সুন্দর বুঝিয়েছেন।

---

(৩)

এর পরে স্বামিজী আনলেন কর্ম্ম রহস্য। কর্ম্ম রহস্য অধ্যায়টির নাম-গত তাৎপর্য্যই বিশেষ লক্ষণীয়। রহস্য মানেই হচ্ছে কোন জটীল গোপন তথ্যপূর্ণ বস্তু। এখানে স্বামিজী কর্ম্মতত্ত্বের বিরাট এবং জটীল সমস্যাপূর্ণ ও রহস্যপূর্ণ প্রশ্নের সহজ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে মীমাংসা ক'রেছেন। সমস্ত কর্ম্মের মধ্যে দান কর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং স্বামিজীর

মতে তন্মধ্যে আধ্যাত্মিক অভাব পূরণ করাই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম এবং শ্রেষ্ঠ দান। মানুষের অভাব পূরণের মধ্যে খাদ্য দান, বস্ত্রদান ইত্যাদি। সব কিছুর মধ্যে অধ্যাত্মজ্ঞান দানই শ্রেষ্ঠ এই হিসেবে যে, অন্য যে কোন দানের ফলই ক্ষণস্থায়ী কিন্তু অধ্যাত্ম জ্ঞানদানের ফলই চিরস্থায়ী। কেন না যে কোন দানের ফলেই মানুষের অভাব পূরণ সাময়িকভাবে হয়, আবার চাহিদা জাগে। সেই কারণে মানুষের কল্যাণ বা তৃপ্তির জন্য, অভাব পূরণের জন্য সমস্ত বিশ্ব দান ভাণ্ডারে, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদিতে ছেয়ে দিলেও এতে মানুষের স্বভাব বদলায় না, অতএব দুঃখ মেটে না—আকাঙ্ক্ষাই সমস্ত অভাব, সুখ দুঃখ চাহিদার মূল এবং একমাত্র আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ হলেই মন থেকে সমস্ত চাহিদা চলে যায়। কাজেই কাম পূরণ করতে পারলেই সব ভার দূর হয় এবং তাতেই জন্মজন্মান্ত সব কামনা বাসনা মিটে গিয়ে মানুষ অমর হয়। কাজেই এটী শ্রেষ্ঠ। এবং এই হিসেবে আত্মজ্ঞান দানের পর বিদ্যাদান শ্রেষ্ঠ। অজ্ঞান মৃত্যুতুল্য, জ্ঞানই জীবন। অতএব পরোপকার সম্বন্ধে বিচারে আমরা যেন শারীরিক প্রয়োজনকে বড় মনে করে বিভ্রান্ত না হই। স্বামিজী আরও বলেছেন—গীতায় ভগবান নিরন্তর কর্ম্ম ক'রে যেতে বলেছেন। কিন্তু প্রত্যেক কর্ম্ম কিছু না কিছু সদসৎ ফল উৎপাদনকারী এবং আত্মার বন্ধনের হেতু। কিন্তু গীতায় কর্ম্ম করা সত্ত্বেও বন্ধন মুক্তির উপায়ও দেখিয়েছে—সেটী অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম করা।

এক্ষণে স্বামিজী অনাসক্তির অর্থ বুঝাতে আগেই আনছেন আসক্তি এবং তার ফল হেতু সংস্কারের কথা—মন বা চিত্তের সঙ্গে হ্রদের তুলনা করেছেন, হ্রদে একটী তরঙ্গ উদ্ভূত হ'য়ে যতই

মিলিয়ে যাক আর একটী তরঙ্গের সম্ভাবনা রেখে যায়, তেমনি আমাদের প্রত্যেকটী ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি এবং ঐ দাগ বা তরঙ্গের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনীয়তার একত্রে নাম সংস্কার। এই সংস্কার কখনও অজ্ঞাতসারে আমাদের মনকে সম্পূর্ণ নিয়মিত করে। আমাদের এই মুহূর্ত্তের কার্য্যকলাপের জন্য পূর্ব্বের সংস্কারপুঞ্জ দায়ী এবং প্রকৃত পক্ষে এই ভাবে চরিত্র গঠিত হয়। সাধু-সংস্কার-প্রবল মানুষ সাধু চরিত্র এবং অসৎ সংস্কারপূর্ণ মানুষ অসাধু হয় ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষকে ভাল বা মন্দ কাজ করায়। স্বামিজীর এই কথার অনুরূপ কথা আমরা গীতায় পাই।

অশুভ সংস্কারযুক্ত মানুষ যেমন অনিচ্ছা সত্ত্বেও অসৎ কাজে মত্ত হয় তেমনি শুভ সংস্কারযুক্ত মানুষ তার সৎপথে শত বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও বা ঘটনা-গতি-বেগেও অসৎ ইচ্ছা করতে ও অসৎ কাজে প্রবৃত্ত হ'তে পারে না, ঠিক যেমন কূর্ম্মের অবস্থা হয়। এখানেও স্বামিজীর উপমার সঙ্গে গীতার রয়েছে মিল।

এর পর স্বামিজী সংস্কার-মুক্তির কথা আনছেন—বললেন, প্রথমে শুভ-সংস্কার রাশির দ্বারা আমাদের অশুভ সংস্কার জয় ক'রে পরে শুভ-অশুভ দুইয়ের পারে যেতে হবে—তবেই হবে আত্মার মুক্তিলাভ। অজ্ঞান কাঁটা জ্ঞান-কাঁটা দিয়ে তুলে দু'টিই ত্যাগ করলে মনের আর কোন বন্ধন মোহ থাকে না—তখন থাকে কেবল মুক্তির আনন্দ।

স্বামিজী আরও ব'লছেন—সমস্ত কর্ম্মই মানুষকে বন্ধন-যুক্ত করে না, আসক্তিই মানুষকে বন্ধন-যুক্ত করে। সারাদিনে শত সহস্র মুখ দেখলেও যে মুখ আমরা ভালবাসি, রাত্রিবেলা বা

সমস্ত কাজের ফাঁকে সেই মুখটীই মনে পড়ে। শত সহস্র মুখের ছাপের চেয়ে ঐ একটি মুখের ছাপ মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া রেখে গেল—এই হেতু বোঝা গেল, আসক্তিযুক্ত কর্ম্মই মনে ছাপ রাখে বা বন্ধনের সৃষ্টি করে। এজন্য নিরন্তর কর্ম্মযোগ ক'রে যেতে হবে। কিন্তু সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যেন তার একটি তরঙ্গও মনকে জয় না করে। ঠিক যেন বিদেশী—দু'দিনের জন্য এসেছে এই জগতে। জগৎ যেন পথ চলার সোপানবিশেষ। মনে রাখতে হবে—আত্মার জন্য প্রকৃতি, প্রকৃতির জন্য আত্মা নয়। প্রকৃতি হবে একটি পাঠ্য-পুস্তকের মত। জ্ঞানলাভ ক'রতে হ'বে তা'র মধ্য থেকে এবং জ্ঞানলাভের পর আর কোন মূল্য বা সম্বন্ধ থাকবে না প্রকৃতির সঙ্গে। এটী আমরা ভুলে যাই ব'লেই আসক্তিযুক্ত হই। আত্মায় প্রবল সংস্কার এসে পড়ে এবং আত্মাকে প্রকৃতির ক্রীতদাস করে ফেলে। কিন্তু স্বামিজী উপদেশ দিলেন—ক্রীতদাস নয়, প্রকৃতির মধ্যে প্রভুর মত কাজ করে যেতে হবে। শৃঙ্খলবদ্ধ ক্রীতদাসের কাজে স্বাধীনতা, প্রেম, ভালবাসা নাই। আমাদের ক্ষেত্রেও এইরূপ—আমরা যদি মোহগ্রস্ত না হই, প্রভুর মত বন্ধন-হীন হ'য়ে কাজ করি তবেই আসবে প্রেম এবং প্রকৃত সুখ। প্রকৃত প্রেম, জ্ঞান এবং প্রকৃত সত্ত্বা একে তিন—অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দেরই ত্রিবিধ রূপ। ইহারই আপেক্ষিক রূপ এই জগৎ—এই জ্ঞানই বস্তু-বিষয়ক জ্ঞানে পরিণত হয় এবং সেই আনন্দই মানুষের যত প্রকার প্রেম আছে তার ভিত্তি হয়। অতএব প্রকৃত প্রেম প্রেমাষ্পদ—প্রেমিকা কারও কষ্টের কারণ হয় না। কর্ম্মযোগে রত থাকা কালে স্ত্রী-স্বামী-পুত্র-কন্যা এবং জগৎ সমুদয়ে এমন ভালবাসা

রাখতে হবে যার কোন প্রতিক্রিয়া থাকবে না। কোন স্ত্রীলোককে ভালবাসলে মনে বন্ধন হয় না, কিন্তু যখন স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে ভালবাসবে, শুধুমাত্র নিজের ক'রে চাইতে যাবে, তখনই মনে ঈর্ষা যন্ত্রণা আসবে—ক্রীতদাসের অবস্থা হবে। অনাসক্ত হ'য়ে ভালবাসাই প্রকৃত প্রেম।

গীতায় ভগবান নিজের নিরন্তর কর্ম্মের দৃষ্টান্ত দিয়ে ব'লেছেন—আমি একমাত্র প্রভু, কাজেই লাভ-অলাভ কোন কারণেই কাজ করি না—শুধু জগৎটাকে ভালবাসি বলেই কাজ করি। জৈব আকর্ষণ, ক্ষুদ্র আকর্ষণ—ভৌতিক আকর্ষণ মাত্র এবং পরস্পরে দু'টী দেহকে খুব নিকটবর্ত্তী না করলে যন্ত্রণা। কিন্তু বিরাট ভালবাসা সহস্র মাইলের ব্যবধানেও ক্ষুণ্ণ হয় না।

অতএব অনাসক্তি লাভই সারাজীবনের লক্ষ্য এবং এতেই সর্ব্বপ্রকারে মুক্তি। প্রত্যুপকারের কোন আশা না রেখে জগতে সর্ব্বত্র কাজ করে যাও, আসক্তি আসবে না। পিতা পুত্রকে স্নেহ ক'রে কোন কিছু দেয়, সে প্রত্যুপকারের আশায় নয়। দাসবৎ কাজেই বন্ধন। প্রতিদানের আশা জগতে সকল নরনারীর, কাজেই সেই লক্ষ্য। কিন্তু প্রভুর কাজে প্রতিদানের আশা থাকে না। দয়া স্বর্গতুল্য এবং অনাসক্তি লাভের উপায়। এখানে স্বামিজীর এই কর্ম্মতত্ত্বের মধ্যে রয়েছে বেদান্তের জ্ঞান, চরম পুরুষকারের সাধনা। এর পর গীতার কর্ম্মযোগের নিরিখ এনেছেন নিজের কর্ম্মরহস্য ব্যাখ্যানে।

আর এক উপায় ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং সমুদয় কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করে কর্ম্ম ক'রলেও বন্ধন আসে না। প্রভু স্বয়ং কাজ

ক'রছেন, মানুষ নিমিত্ত মাত্র—এই বোধে কাজে বন্ধন, আসক্তি নাই—পদ্ম পত্রকে যেমন জল সিক্ত করতে পারে না ঠিক তেমনি। স্বামিজীর এই কথার সঙ্গে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে 'ত্বমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত' এই ভগবৎ শরণ নিয়ে কর্ম্ম করলে হাজার পাপসঙ্কুল পরিস্থিতিতেও মন বন্ধনযুক্ত হয় না।

স্বামিজী সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ ভাবটী মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডবের একটি গল্প দ্বারা বুঝিয়েছেন। কিন্তু স্বামিজী আক্ষেপ করেছেন ভারত থেকে এমন উচ্চ স্বার্থত্যাগ ও দয়ার ভাব চলে যাচ্ছে।

স্বামিজী ছোটতে যখন ইংরাজী পড়তে শেখেন তখন একটী গল্পের বইতে পড়েছিলেন—একটী বালক যা উপার্জ্জন করতো তার অধিকাংশ মাকে দিত। তার এই গুণে মুগ্ধ লেখক ৩।৪ পাতা ধরে তার প্রশংসা করেন। কিন্তু এই প্রশংসা পড়ে ভারতের কোন বালক পর্য্যন্ত মুগ্ধ হবে না—কেন না, ভারতের স্বার্থত্যাগ ভালবাসা ইত্যাদির আদর্শ অনেক উঁচু সুরে বাঁধা। পাশ্চাত্যে ভোগবাদ এবং আত্মসুখ স্বার্থই প্রধান। প্রতিদান, আত্মপ্রশংসা কোনদিকে দৃষ্টি না দিয়েই দান করে যাও এবং সেই সৌভাগ্য করেছ বলে নিজেকে ধন্য মনে কর, এইটীই কর্ম্মযোগীর আদর্শ—স্বামিজীর এই কর্ম্মযোগী গৃহীর আদর্শ সন্ন্যাসী অপেক্ষাও কঠিন।

---

(৪)

কর্ত্তব্য কি ?

কর্ম্মযোগের তত্ত্ব বুঝতে গেলে প্রথমেই জানতে হবে কর্ত্তব্য কি এবং সে'টা করবার শক্তি আছে কি না। কিন্তু কর্ত্তব্য কথাটির সার্ব্বভৌম নিরিখ করা কঠিন। বিভিন্ন ধর্ম্ম, জাতি ও শাস্ত্রের কর্ত্তব্য-সংজ্ঞাও বিভিন্ন।

যখন কতকগুলি ঘটনা সম্মুখে ঘটে তখন সকলের মনেই সেইগুলি সম্বন্ধে কোন বিশেষভাবে কাজ করবার জন্য স্বাভাবিক অথবা পূর্ব্বসংস্কারানুযায়ী ভাবের উদয় হয় এবং এই পরিস্থিতিতে এইভাবে করা সঙ্গত এই সাধারণ ধারণা দেখা যায়। সেইরূপ সৎলোকের সদাজাগ্রত বিবেক অনুযায়ী কাজ হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে—পরিস্থিতি অনুসারে, দেশকাল অনুসারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়। খৃষ্টান যদি নিজের এবং অপরের আহারের প্রয়োজনে গোমাংস পেয়েও কাজে না লাগায় অন্যায় হয়। আবার এইরূপ ক্ষেত্রে একজন হিন্দু যদি ওই মাংস ভোজন করে বা করায় তা'ও পাপ বলে গণ্য হয়। একজন ঠগ-দস্যুর আদর্শ—যত মানুষ খুন করবে, ততই গর্ব্বের বিষয়—যেমন করে পার পরস্বাপহরণই তাদের আদর্শ। সাধারণ মানুষ নরহত্যাকে অতিশয় পাপ মনে করে, আবার সৈনিক যুদ্ধকালে যত নরহত্যা করতে পারে ততই খুশী হয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে কার্য্য বিচার ক'রেই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ হয় না।

সেজন্য বাইরের দিক থেকে কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য লক্ষণ ঠিক করা যায় না--তবে অন্তরের দিক থেকে ঠিক করা যায়। যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভগবৎ অভিমুখে মানুষকে নিয়ে যায়, সে'টিই সৎকার্য্য আর

তা'ছাড়া যা কিছু মনকে হীন নিম্নগামী করে, পশুভাবযুক্ত করে তাই-ই অসৎ কাজ এবং পরিত্যাজ্য। কিন্তু এও ঠিক যে, সর্ব্ববিধ ব্যক্তির পক্ষে কোন্ কার্য্য মনে কিরূপ ভাব আন্‌বে সঠিক বলা যায় না। তবে একটী কর্ত্তব্য সর্ব্ববাদীসম্মত বলে জানা গেছে – সে'টী 'পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্।'

গীতায় ভগবান জন্ম ও অবস্থাগত কর্ত্তব্য অর্থাৎ সমাজগত বিধি-নিষেধ মানাই কর্ত্তব্য বলেছেন। স্ব স্ব সামাজিক অবস্থা-সঙ্গত অথচ হৃদয় মনের উন্নতিকারক কাজই কর্ত্তব্য। কিন্তু সকল দেশে একই নিয়ম, একই আদর্শ অনুসরণ করা চলে না—ভারতে যেটী আদর্শ, সেটী মার্কিণে ঘৃণার্হ। যেমন স্বামিজীর ভারতীয় সন্ন্যাসীর পোষাক দু'বার দু'জন সাহেবের ঘৃণা ও দুর্ব্যবহারের কারণ হয়েছিল। কিন্তু স্বামিজী যখন তাদের এই অসৎ আচরণের সম্বন্ধে ইংরাজীতে প্রশ্ন করেন তখনই তা'রা খুব অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়েন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আসলে স্বামিজীর অদ্ভুত পোষাক তাদের মনে ঘৃণা উৎপাদন করেছিল। অথচ সেই লোকগুলির অন্য বহু সৎগুণ ছিল। সেইরূপে বহু লোকই বিদেশে গেলে অত্যাচারিত হয়ে থাকে এবং পরদেশ সম্বন্ধে ভুল ধারণা নিয়ে যায়। সৈনিক, নাবিক ও বণিকগণ বিদেশে এমন অদ্ভুত আচরণ করে যা' তা'রা নিজের দেশে থাকতে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

সুতরাং শিক্ষার একটী কথা সকলকে মনে রাখতে হবে যে অপর দেশের আচার, শিক্ষা, রীতি বিচার করতে কখনও নিজের মাপকাঠি ধরলে চলবে না—আমাকেই সমুদয় জগতের সঙ্গে মিলে মিশে চ'লতে হবে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে কর্ত্তব্য-কর্ম্মের কত

পরিবর্ত্তন হচ্ছে। অতএব প্রথমে মানুষের নিজের দেশের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা উচিৎ। মানুষের একটী বিশেষ দুর্ব্বলতা যে নিজের দিকে দৃষ্টি রাখে না। এবং নিজেকেও বানায় উপযুক্ত। কিন্তু যদিও সে উপযুক্ত হয় তথাপি দেখানো উচিৎ যে, সে অগ্রে নিজ অবস্থা সঙ্গত কাজ করেছে। অতি ক্ষুদ্র কাজও অগ্রে উত্তম-রূপে সমাধা করে ক্ষমতা অর্জ্জন করলেই তবে উচ্চতর কাজ আসবে। আমরা আগ্রহান্বিত হয়ে দায়িত্বপূর্ণ কাজ করলেই চতুর্দ্দিকে হ'তে কাজের তরঙ্গ আপনি উপস্থিত হবে এবং ঠিক করে দেবে আমি কোন্ পদের যোগ্য। যে যে কাজের যোগ্য নয় সে সেই কাজ ক'রে কোনদিনই লোকের সন্তোষ উৎপাদন করতে পারে না। আবার কেউ ছোট কাজ করেছে বলে তাকে ঘৃণা করা উচিৎ নয়।

এইভাবে দেখলে আমাদের কর্ত্তব্যের ধারণাও উল্‌টিয়ে যায়। যখন বাসনার উত্তেজনা মনে থাকে না তখনই মানুষ শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম করে। কর্ত্তব্যজ্ঞানে কার্য্য সাধনাই কর্ত্তব্যজ্ঞানের অতীত সাধনায় নিয়ে যায়। তখনই কার্য্য উপাসনায় পরিণত হয়। কর্ত্তব্য কর্ম্ম বা আদর্শ কর্ম্ম যে ভিত্তির উপর স্থাপিত তার রহস্য হচ্ছে কাঁচা আমিকে পাকা আমি করতে হবে। নীচ বাসনা উদয়েও যদি সংযম অভ্যাস সিদ্ধ হয় তাহ'লেই আত্মার মহিমা প্রকাশিত হয়। এর জন্য চাই অবশ্য স্বার্থত্যাগের সঙ্কল্প। সমাজ সদসৎ পরীক্ষাভূমি।

স্বার্থপরতা ইন্দ্রিয়পরায়ণতা থেকে পাপ ও অসাধুতার সৃষ্টি—আবার সংযম ও নিঃস্বার্থভাব থেকেই ধর্ম্মের বিকাশ ও মানবের প্রকৃত স্বরূপের অনন্ত বিস্তৃতির পথ খুলে যায়।

কর্ত্তব্য কিন্তু কম সময়ই মিষ্ট লাগে। কেবলমাত্র প্রেমই কর্ত্তব্যকে মধুসিক্ত করে। মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকে কে কতটুকু অপরের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে পারছে জগতে এত সংঘর্ষ তো সেজন্যই। কিন্তু প্রেমযুক্ত হয়ে কর্ত্তব্যে সব মধুময় হয়—এ প্রেম কিন্তু স্বাধীনভাবে কর্ম্মেই লাভ করা যায় এবং ক্রোধ ইন্দ্রিয়-সুখ-চেষ্টা, ঈর্ষা ইত্যাদি ক্ষুদ্রতা ত্যাগেই মেলে ঠিক স্বাধীনতা। স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরে দোষারোপ করে ব'লেই অশান্তি আসে। কিন্তু মনে রাখতে হবে—শুধু সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রেই নয়, সংসারীদেরও ক্ষেত্রে সামাজিক কল্যাণে সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মচর্য্য চেষ্টা অর্থাৎ সংযমের চেষ্টা। প্রত্যেক স্ত্রী যদি নিজ স্বামী ছাড়া অপর পুরুষের প্রতি সন্তান-স্নেহ পোষণ করে এবং প্রত্যেকটি পুরুষই যদি নিজ স্ত্রী ছাড়া অপর স্ত্রী মাত্রেই মাতৃবৎ কি কন্যাবৎ জ্ঞান করেন, তাহ'লে সর্ব্বজাতির সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের সমাজই এক মহান্ আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। পশুভাব জগৎ থেকে স'রে যায়। যে কোন অন্যায়কারী পবিত্রতার স্পর্শে এসে মহৎ যদিই বা না হয় অন্ততঃ মহত্ত্ব অনুভব করতে বাধ্য হয়। আর সন্ন্যাসী মাত্রেই জগতের সমুদয় স্ত্রীমূর্ত্তিতে যদি মাতৃজ্ঞান করে তবেই জগতের কল্যাণ। মাতৃপদই জগতের শ্রেষ্ঠ পদ। এতেই সর্ব্বাপেক্ষা নিঃস্বার্থপরতা। একমাত্র ভগবৎ প্রেম ছাড়া মাতৃপ্রেমের কাছে সবই নিকৃষ্ট। একমাত্র মা-বাপই আত্মভোলা হয়ে সর্ব্বাগ্রে কুশল চিন্তা, সুখ-সুবিধার চিন্তা করেন এবং সেইজন্যই মনুষ্য-সমাজ পশু-পক্ষী থেকে উন্নত। প্রতিটী স্ত্রীলোক যদি পুরুষ মাত্রেই ভগবানের পিতৃরূপ এবং প্রতিটী পুরুষ যদি স্ত্রী মাত্রেই ভগবানের প্রেমময়

মাতৃমূর্ত্তি এবং প্রত্যেক সন্তানই যদি পিতামাতাকে ভগবানের প্রকাশ জ্ঞানে সক্ষম হয় তাহ'লে সমাজ ধন্য হ'য়ে যায়।

উন্নতি লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে আমাদের হাতের কাছে রয়েছে যে কর্ত্তব্য সেগুলি নিপুণভাবে সাধন ক'রে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় ক'রে উন্নত পথে এগিয়ে যাওয়া। কোন কাজ অপেক্ষা অপর কাজ ছোট বা হীন মনে ক'রবে না। শুধু কর্ত্তব্য সম্পাদনের নিপুণতাতেই মহত্ত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে ওঠে। একজন উদ্বক্তা অধ্যাপক অপেক্ষা অতি অল্প সময়ে সুন্দর জুতা তৈরী-কারী মুচিই শ্রেষ্ঠ।

দু'টী সুন্দর গল্পের দ্বারা স্বামিজী দেখিয়েছেন যে, অতি সামান্য কাজের দ্বারাও জ্ঞান লাভ করা যায়—কোন কর্ম্মই হীন নয়। প্রথম গল্পটী মহাভারতের ধর্ম্মব্যাধের কথা—যেটী ব্যাধগীতা নামে খ্যাত, চূড়ান্ত বেদান্ত দর্শনের চরম সীমা। সে'টী কর্ম্মযোগে উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়েছেন যে, কোন কর্ম্মই হীন নয়।

এর পর স্বামিজী পাওহারী বাবার কথা উল্লেখ ক'রে ব'লেছেন—তিনি মস্ত বড় যোগী হ'লেও আচার্য্যপদবী গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন। কোন প্রশ্নের মীমাংসা সঙ্গে সঙ্গে করতেন না, কিছু যাতায়াতের প্রসঙ্গে তার মীমাংসা নিজেই করে দিতেন। তিনি স্বামিজীকে কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে বলেন—যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি। অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ পূজাস্বরূপে কর্ম্ম করে যাও, সেইটী চরম সিদ্ধি এনে দেবে। ব্যাধ ও পতিব্রতা স্ত্রী সর্ব্বান্তঃকরণে সন্তোষের সঙ্গে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করায় দিব্যজ্ঞান লাভ এবং দিব্যজ্ঞান দানে সমর্থ হ'য়েছিল। এইজন্য ঠিক ঠিক অনাসক্তভাবে অনুষ্ঠি[illegible]লে যে কোন কর্ম্মই পরমপদলাভে সমর্থ করে।

পারিপার্শ্বিক অনুসারে বেশীর ভাগ মানুষের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হয়। কামনাই মানুষের মনে কর্ত্তব্যের বিচার উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট বোধ এনে দেয়। স্বার্থে আঘাত লাগলেই মানুষের মনে বিরক্তি আসে সব কাজে। কিন্তু অনাসক্ত হয়ে কাজ করলে তখন মান-অপমান, কামনা-বাসনা থাকে না—কাজেই ক্ষুদ্র কাজ কি সম্মানার্হ কাজ এ বোধ থাকে না। প্রত্যেক মানুষই নিজের সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করে। কিন্তু প্রকৃতি খুব কঠোরভাবে প্রত্যেকের কর্ম্মানুযায়ী ন্যায়ানুগত ফলদান করে।

প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা হৃদয়ের সমুদয় সৎ ও কোমল বৃত্তিগুলিকে নষ্ট করে দেয়—কাজেই এ বৃত্তি নিয়ে কাজ করলে শান্তি পাবে না। অতি নিকটে যে কর্ত্তব্য প'ড়ে র'য়েছে সেগুলি সন্তোষের সঙ্গে সাধন ক'রে গেলে ক্রমে সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানজনক কাজের সক্ষমতা লাভ করবে।

---

(৫)

এর পর স্বামিজী পরোপকারে কার উপকার সে সম্বন্ধে ব'লেছেন, প্রত্যেক ধর্ম্মের তিনটী বিভাগ আছে। দার্শনিক পৌরাণিক ও আনুষ্ঠানিক। দার্শনিক ভাগই ধর্ম্মের সার স্বরূপ, পৌরাণিক তার বিবৃতি মাত্র। ওতে ধর্ম্মতত্ত্ব মহাপুরুষগণের অল্প বিস্তর কাল্পনিক জীবনী ও অলৌকিক কাহিনী ইত্যাদি দ্বারা ব্যাখ্যাত। আর আনুষ্ঠানিক ভাগই দার্শনিক ভাগের স্থূল রূপ। সূক্ষ্ম-তত্ত্বসমূহ

সাধারণে ঠিক ঠিক ধারণা করতে পারে না, কাজেই প্রতীকের সাহায্যে ক্রিয়া অনুষ্ঠানের ও ধর্ম্ম সাধনা করার বিধি আছে এবং প্রত্যেক ধর্ম্মেই এটী একান্ত আবশ্যক। প্রতীক সব ধর্ম্মেই সেই অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। এগুলির অনেকগুলিই সার্ব্বজনীন। ক্রুশ খৃষ্ট ধর্ম্মের বহু পূর্ব্ব থেকে আজ্‌টেক ও ফিনিসীয়দের মধ্যে প্রচলিত ছিল। স্বস্তিক চিহ্ন প্রাচীনকালে বহু জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল এবং এগুলি মানুষের সৃষ্ট নয়। কতকগুলি লোক কখনও বৈঠক বসিয়ে কতকগুলি ভাবকে বিশেষ বিশেষ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করবে এইরূপ চুক্তি করে নি। শব্দ ও ভাব অবিচ্ছেদ্য। যেমন কৃত্রিম উপায়ে ভাষা সৃষ্টি করা অসম্ভব সেইরূপ প্রতীক সৃষ্টিও অসম্ভব। জগতে অনুষ্ঠানে সহকারী যে সকল প্রতীক সেগুলি ধর্ম্ম চিন্তার এক এক রূপ বিশেষ মাত্র। আজকাল বেশী ভাগ লোকেই প্রতীক পূজা, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও মন্দিরাদির কোন প্রয়োজন বোধ করে না। কিন্তু এগুলি সবই ধর্ম্ম রাজ্যে চিন্তার সুবিধা করে এবং ঐ সকলের অভ্যাসই কর্ম্মযোগের অংশ স্বরূপ।

কর্ম্মবলে যোগ 'ভাব' ও 'শব্দ' এর মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে এবং শব্দ শক্তিতে কি হ'তে পারে সেটী জানা। শব্দ-শক্তি সব ধর্ম্মেই স্বীকৃত হয়েছে। কোন কোন শাস্ত্রে সৃষ্টিটাকেই শব্দ জাত বলা হয়েছে। ঈশ্বরের সঙ্কল্পের বাহ্যভাব শব্দ এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বর সঙ্কল্প ও ইচ্ছা করেন। সেই হেতু সৃষ্টি শব্দ জাত। মানুষ যত বৃদ্ধ হয়, স্নায়ু উত্তেজনা কমে যায় এবং জগতে অবহেলা আসে, তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় ও বিস্মিত হয়। এই বিস্ময় প্রকাশই জীবনের প্রথম প্রকাশ। ধর্ম্ম ও দর্শনের জটীল তত্ত্ব প্রকাশ ছাড়াও

শব্দের অদ্ভুত ক্ষমতা। মানুষের মুখোচ্চারিত শব্দের অদ্ভুত ক্ষমতা মানুষকে ক্রুদ্ধ, কোমল, শান্ত ক'রে ফেলতে পারে। কি উচ্চ দর্শনে কি সাধারণ জীবনে শব্দ-শক্তির পরিচয় আমরা সব সময়ই পাই। শব্দ ব্যতিরেকে চিন্তাই অসম্ভব। এই শব্দ-শক্তির স্বরূপ জানা ও উত্তমরূপে পরিচালনাও কর্ম্মযোগের অংশবিশেষ।

অপরের প্রতি উপকারের বা কর্ত্তব্যের অর্থ নিজেই উপকৃত হওয়া। এই কথাটা সব সময় মনে রাখতে হবে। কেন না, জগৎ আমাদের কাছে কিছুই চায় না। জগতে যথেষ্ট দুঃখ আছে—এ'টী খাঁটী সত্য। সুতরাং অপরের দুঃখ দূর করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য কিন্তু জগৎ তার জন্য চেষ্টিত নয়। জগৎ ভালও নয়, মন্দও নয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সৃষ্ট ক্ষুদ্র জগতে বাস করছি। অন্ধ ব্যক্তি জগৎকে মনে করে ঠাণ্ডা বা গরম। যুবারা সুখবাদী—সারাজীবন প'ড়ে আছে। কিন্তু বৃদ্ধেরা দুঃখবাদী—তাদের জীবন ফুরিয়ে এসেছে। মনে মনে অনেক বাসনা—কিন্তু ভোগের সময় নেই। কিন্তু এ সবের কোনটাই ঠিক নয়, জগৎ ভালও নয়, মন্দও নয়। অগ্নি ব্যবহার অনুসারে ভালো বা মন্দ হয়। যখন উপকার করে তখন ভালো, যখন অপকার করে, হাত পোড়ায় তখন মন্দ। আবার যখন শীতে উত্তাপ জোগায় তখন ভালো বলে বর্ণিত হয়। কিন্তু আগুন আসলে ভালও নয় মন্দও নয়। জগৎও স্বয়ংসিদ্ধ। সমুদয় চাহিদা পূরণে স্বয়ং সমর্থ। আমরা জগতের উপকারে মাথা না ঘামালেও জগৎ ঠিক চলবে। কিন্তু তথাপি জগতের উপকার করতে হবে—পরোপকারের সুযোগে নিজেকে ধন্য মনে করতে হবে। মানুষের চেষ্টাকৃত হাসপাতাল ইত্যাদির পেছনে অর্দ্ধেক

হয়তো চুরির মধ্যে চ'লে যায়, যে কোন মুহূর্ত্তে সেই হাসপাতালও জগৎ থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেতে পারে। কিন্তু তথাপি পরোপকারার্থে কাজ ক'রতে হবে এবং তা'তে অহঙ্কৃত বা আত্মপ্রশংসাযুক্ত হ'লে চলবে না—পরন্তু দুঃখী মানবকে ভগবান জ্ঞানে সেবা করতে পারার সামর্থ্যে নিজেকে ধন্য ও কৃতজ্ঞ মনে করতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রতিদানের আশা-আসক্তি এসব রাখলে চলবে না। জগতের সুখ-দুঃখ চিরদিনের। ওরা থাকবেই—বহু শত বৎসরের অসংখ্য লোকের সাধনায় ও দানে তার অভাব ঘুচছে না বা ঘুচবে না। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য রাখলে চ'লবে না। এই ব'লে স্বামিজী ভূত সিদ্ধের গল্প ব'ললেন—জগতের যত উপকার করো তবু অভাব যাবে না—তবুও আমাদের নিজেকে ধন্য করার জন্যে জগতের উপকার ক'রতে হবে।

আর কর্ম্মকালে মনে রাখতে হবে, গোঁড়ামি ছাড়তে হবে। জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও গোঁড়া হয় না। গোঁড়া লোক কখনও জাগতিক উন্নতিসাধনে সক্ষম হয় না বরং অশান্তি, ঘৃণা, ক্রোধ সৃষ্টি করে। নিজের গোঁড়ামির দ্বারা জগৎ সংস্কার করার আগে ভাবা উচিৎ পরমেশ্বরের জগৎ—তিনি ঠিক সুপরিচালিত ক'রবেন সকলকে। গোঁড়ামিতে সকলের প্রতি সহানুভূতি-হারা হ'য়ে মানুষ সহজে উত্তেজিত হ'য়ে পড়ে। কিন্তু অতিশয় সহানুভূতিসম্পন্ন শান্তি-প্রিয় প্রেমিক লোকই জগতে মহৎ কার্য্য সম্পন্ন ক'রতে পারে।

পাশ্চাত্যে পিউরিট্যানরা অমনি অপরের ওপর ভীষণ অত্যাচার করেন—পবিত্রতা আনয়নকল্পে। এও গোঁড়ামি। মে ফ্লাওয়ার জাহাজ থেকে পূর্ব্বপুরুষগণ এসেছেন এই ধারণাও সাহেবদের এক

রকম গোঁড়ামি। এই গোঁড়ামি একটী রোগবিশেষ—অজীর্ণ রোগী বা যকৃতের রোগীদের বোধ হয় এই রোগ হয়।

মাতালের নেশার পেছনেও দেখা যায় বিশেষ কোন কষ্ট ভোলার চেষ্টা। মাতৃজাতির দোষই প্রধানতঃ তাদের স্বামীর মাতাল হওয়ার কারণ। বেশীর ভাগ মহিলাই অতিমাত্রায় ধৈর্য্য-হারা এবং স্বামীকে হাতের মুঠোয় রাখতে চায়। তার ফলেই স্বামীও হয়ে পড়ে আরো মাতাল, আরো অত্যাচারী। কাজেই কা'কেও ঘৃণা না ক'রে তা'র সত্যিকারের দুঃখের কারণ জেনে তা'কে ভালবেসে তা'র কল্যাণে ব্রতী হও, দেখবে অনেক কাজ হবে।

অতএব কর্ম্মযোগীকে মনে রাখতে হবে, পরোপকারে আমরা জগতের কল্যাণ করি না—নিজেদেরই কল্যাণ করি। জগতের স্রষ্টা ও পালনকর্ত্তা ঈশ্বর জগৎ চালনায় সদা ব্যস্ত—এজন্যেই জগৎ আমাদের অপেক্ষা করে না। আরো একটী কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, জগৎ শুভাশুভের সংমিশ্রণে গঠিত—কাজেই কারোকে ঘৃণা করা চলবে না, অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করতে হবে। শেষ কথা—গোঁড়ামি ছেড়ে আমরা যত প্রেমযুক্ত হব, ততই সুষ্ঠুরূপে কাজ করতে পারবো।

---

(৬)

এরপর স্বামিজী অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ এ সম্বন্ধে বলেছেন—মানুষের স্বকৃত প্রত্যেকটী কর্ম্মই ফলরূপে ফিরে আসে এবং অপর ব্যক্তির ওপরও প্রভাব বিস্তার করে। কোন মানুষ অসৎ কাজের

অভ্যাস করলে তা'র সেই প্রবৃত্তি বেড়ে যায়, আবার সৎ অনুষ্ঠানের দ্বারা সৎ প্রবৃত্তিও বেড়ে যায়। একই ধরণের মনের মানুষের ওপর সেই ধরণের একটী মানুষের কাজ খুব প্রভাব বিস্তার করে। যেমন একটী ঘরে একই সুরে বাঁধা বাদ্যযন্ত্রের যে কোন একটীতে সুর সংযোগে যেমন সব যন্ত্রগুলিতে কম্পন সৃষ্টি করে—তেমনি কোন অসৎ কর্ম্মকারীর প্রভাব সেই ধরণের অসৎ লোকেদের ওপর খুব প্রভাব বিস্তার করে। সৎকাজও ঠিক তেমনি।

আলোক-কম্পন ও শব্দ-কম্পন যেমন লক্ষ লক্ষ বৎসর শূন্যে ভ্রমণ ক'রে বস্তুবিশেষে, যন্ত্রবিশেষে ক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠে, তেমনি মানুষের সৎ-অসৎ প্রত্যেকটী কাজের সূক্ষ্ম কম্পন বা প্রভাব আকাশে থেকে যায় এবং স্থান-কাল-পাত্র বিশেষকে প্রভাবিত করে। কোন অসৎ কর্ম্মীর কর্ম্মপ্রভাব সূক্ষ্মাকারে আকাশে অনুস্যূত থাকে, আবার যখন লোক সেই ধরণের কাজে প্রবৃত্ত হয় তখন আকাশস্থিত সেই পূর্ব্বকথিত অসৎ ব্যক্তির কর্ম্ম তা'কে আরো প্রভাবিত করে। এইরকম একবার অন্যায়ে পা বাড়ালে আর ফেরার সম্ভাবনা থাকে না—সে একে একে অন্যায়ই ক'রে যেতে থাকে। আবার সৎকাজের প্রভাব সৎকাজের প্রেরণা যোগায়। কাজেই অসৎ কাজের আগে মানুষের প্রত্যেকের বোঝা উচিৎ যে, এরই প্রভাব আকাশে রয়ে যা'বে এবং পরবর্ত্তীকালে সে'টী যে কোন ব্যক্তিকে অসৎ কাজে প্রেরণা যোগাবে।

যে কোন কর্ম্মই ফল প্রসব না ক'রে নষ্ট হয় না। প্রকৃতির কোন শক্তিই কর্ম্মের ফল প্রসব-শক্তিকে রোধ ক'রতে পারে না। ভালো কাজের মত মন্দ কাজেও ফল ফলেই। কিন্তু একটা জিনিষ

মনে রাখতে হবে—কাজ সর্ব্বতোভাবে শুভ বা সর্ব্বতোভাবে অশুভ হ'তে পারে না—কিছু না কিছু শুভ-অশুভ প্রত্যেক কাজেই থাকে। যেমন ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনায় কত শত ব্যক্তির আত্মিক উন্নতি হয়, আবার ঠিক সেই সময় কথা বলতে গিয়েই কত শত কীটাণুর ধ্বংসের কারণ হয়। কাজেই যিনি শুভ-কর্ম্মের মধ্যেও কিছু অশুভ আবার অশুভের মধ্যেও কিঞ্চিৎ শুভ দেখেন, তিনি প্রকৃত কর্ম্মরহস্য বুঝেন।

কর্ম্মযোগের শিক্ষায় পেলাম কি? পেলাম এই যে, এমন কোন কাজ নেই যেটী সম্পূর্ণ অপবিত্র কি সম্পূর্ণ পবিত্র। আমাদের বেঁচে থাকাই একটা স্বার্থপরতা। অপরের মুখের গ্রাস খেয়ে বেঁচে থাকা, অপর মানুষই হোক্ আর জীব-জন্তুই হোক্ সেই অন্ন খেতে পারত। এইভাবে বেঁচে পৃথিবীর স্থান সঙ্কোচও ক'রছি। কাজেই দেখা যাচ্ছে—কর্ম্ম দ্বারা পূর্ণতা লাভ হয় না। ক্রমাগত কাজের দ্বারাও কর্ম্ম শেষ হয় না।

দ্বিতীয় কথা—অনেকের বিশ্বাস, এক সময়ে জগৎ পূর্ণতা লাভ করবে—ব্যাধি, মৃত্যু, অসাধুতা কিছু থাকবে না। কিন্তু এটী হ'তেই পারে না। ভাল-মন্দ মিশিয়ে জগৎ—জীবন মানেই সংগ্রাম—প্রতি মুহূর্ত্তে মানুষের অন্তর বহির্জগতের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে বেঁচে আছে। সংগ্রামে অক্ষম হলেই মৃত্যু। কাজেই শুদ্ধ, সৎ, সংগ্রামবিহীন জগতের অস্তিত্বই নেই।

অপরের উপকারে নিজেরই কল্যাণ আত্মশুদ্ধি—নিজের সুখের অন্বেষণে প্রকৃত সুখ নেই, স্বার্থপরতা নাশে প্রকৃত সুখ। সহানুভূতি পরোপকার এসবের দ্বারা ক্ষুদ্র আমি কমে যায়। এক্ষেত্রে জ্ঞানী,

ভক্ত, কর্ম্মী সবেই একমত। পূর্ণ আত্মত্যাগ—সব তুমি—এটিই কর্ম্মযোগীর লক্ষ্যস্থল। আত্মত্যাগই সব শাস্ত্র, জীব, জন্তু, মানুষ, দেবতা—সবেরই মাপকাঠি। এই মাপকাঠিতে দেখবে, জগতে অনেক রকম লোক আছে। দেব-প্রকৃতির লোকেরা নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়ে অপরের উপকার করেন। এইরূপ একশ' জন লোক থাকলে দেশের কল্যাণ। আর আছে সাধুজন—এরা নিজের ক্ষতি না হওয়া পর্য্যন্ত উপকার করেন। কিন্তু অসুর-প্রকৃতিরা নিজের স্বার্থের জন্য অপরের অনিষ্ট করেন। নিকৃষ্ট লোকেদের ক্ষতি করাই উদ্দেশ্য—তাতে লাভ কিছু হোক্ আর নাই হোক্। অতএব এজন্য দেখা গেল স্বার্থত্যাগই শ্রেষ্ঠ।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি—প্রবৃত্তি চায় নাম-যশ, টাকা-কড়ি সবই। সব-কিছুকে আত্মকেন্দ্রিক ক'রতে। আর নিবৃত্তি পরার্থে মন শরীর এমন কি সমুদয় ত্যাগ করতে সর্ব্বদাই সক্ষম রাখে। কর্ম্মযোগের এইটী আদর্শ। জ্ঞানী বা ভক্ত, যাঁরা ভগবৎ-তত্ত্বে বিশ্বাসী—তাঁরা ছাড়াও যারা সারাজীবনে ধর্ম্ম, শাস্ত্র, ঈশ্বর কোন কিছুতেই বিশ্বাসী নন, কিন্তু সৎকার্য্যে নিজের স্বার্থ নিঃশেষে বলি দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত—তাঁরাও, সেই একই স্থানে পৌঁছাতে সক্ষম হন। ধর্ম্মে, শাস্ত্রে, দর্শনে বিভিন্ন শ্রেণীর বা জাতির মধ্যে যতই প্রভেদ থাকুক, নিঃশেষে আত্মত্যাগের প্রশংসা সর্ব্বত্র, সে ভগবৎ-তত্ত্ব বিরহিত হ'লেও। সাধক ভক্ত সর্ব্বত্যাগে, 'তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ' এই ভেবে, ভগবৎ শরণ নেয়। জ্ঞানী সর্ব্বজীবে অভেদ দর্শন ক'রে স্বার্থ-বুদ্ধি ত্যাগ করে। শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীরও তদ্রূপ হওয়া উচিৎ—নিঃস্বার্থতাই ভগবান।

জৈন ইত্যাদি ধর্ম্ম-দর্শনে সংসার-চক্র থেকে মুক্তিলাভের জন্য মৃত্যুবরণ ন্যায়সঙ্গত ব'লেছে। কিন্তু গীতায় ভগবান বলেছেন—মুক্তির জন্য সংসার ত্যাগ, কর্ম্মত্যাগের প্রয়োজন নেই। নিজের জন্য করছি না, সব কাজই অপরের জন্য করছি—এই বোধ ঠিক ঠিক এলেই সংসারের শত বন্ধনের মাঝে থেকেও মুক্তি লাভ সম্ভব। আন্তরিক ভোগ-বাসনা দূর ক'রে সংসারের কাজও কর্ম্মযোগ। আহাম্মকেরা মনে করে ভোগার্থে জগৎ সৃষ্টি, আমারই সব ভোগে অধিকার। পরস্পরকে খাও ইত্যাদি নীতি আর পরস্পরকে খাওয়া-খাওয়ি এইরূপ রীতি এরই অনিবার্য্য ফলশ্রুতি।

কাজেই কর্ম্মে রত থাকতে অনাসক্তিই বড় কথা। কর্ম্মে সাক্ষিস্বরূপ অবস্থান কর। আপন সন্তানকে ধাত্রীবৎ পালন কর। তোমার-আমার সাহায্য ব্যতীতও জগৎ বেশ সুন্দরভাবে চলবে—প্রকৃতির গতি কারো জন্যও বন্ধ থাকবে না। জগৎ তোমার সাহায্যের অপেক্ষা করে না। তুমি তোমার আত্মিক শিক্ষার জন্য পরোপকার করছো—এই বোধে কর্ম্ম কর। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সব ম'রে গেলেও জগৎ অচল হবে না। এইভাবে কাজে কোন মানসিক প্রতিক্রিয়া আসবে না। দান করে অহঙ্কৃত না হ'য়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতে হবে। ভাল-মন্দের প্রভেদ কেবল স্বার্থবুদ্ধি থেকে আসে। নিঃস্বার্থ হও, অনাসক্ত হও, দেখবে সকল কিছুর ওপর প্রভুত্বের অধিকার আসবে। যিনি জাগতিক সুখ-দুঃখে বিচলিত হন না, তিনি শুভ-অশুভ সব ক্ষেত্রেই অনড়।

এখানে স্বামিজী ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেবের সর্ব্বাবস্থায় অবিচলিত থাকার উদাহরণ দিলেন। ব্যাসের পূর্ব্বপুরুষ ঠিক

সম্পূর্ণ সিদ্ধ ছিলেন না। তাই ব্যাসদেব নিজে পুত্রকে সাধ্যমত শিক্ষা দিলেন এবং পরিশেষে জনক-সভায় পাঠালেন। ব্রহ্মবিদ্যা লাভার্থে তিনদিন কোন অভ্যর্থনা ব্যতিরেকেই শুকদেব সভার বহির্দ্বারে ব'সে রইলেন। কিন্তু এতেও তাঁর কোন দুঃখ হ'ল না। তৎপরে মন্ত্রী ও পারিষদ সকলে আদর-অভ্যর্থনা ক'রে, সেবা-যত্ন ক'রে নৃত্যগীতাদির দ্বারা অতিথি-পূজা ক'রলেন—এখনও শুকদেব নির্ব্বিকার, কিছুতেই আনন্দে অধীর হ'লেন না। তখন জনক শুককে ব'ললেন—একপাত্র দুধ নিয়ে এই নৃত্যগীতরত সুন্দরী নারী পরিবৃত সভা সাতবার প্রদক্ষিণ কর—দেখো, এক ফোঁটাও দুধ যেন মাটীতে না পড়ে। শুকদেব আজন্ম সিদ্ধপুরুষ—মনের ওপর অসীম ক্ষমতাযুক্ত, কাজেই একটী ফোঁটাও দুধ না ফেলে জনকের কাছে নামিয়ে দিলেন। জনক সন্তুষ্ট হ'য়ে ব'ললেন—তুমি সিদ্ধ হ'য়েই আছ, তোমাকে নোতুন জ্ঞান দেবার আর কিছুই নাই, তুমি গৃহে গমন করো।

কাজেই দেখা গেল, যিনি আত্মবশ ক'রেছেন তাঁর কাছে দুঃখ সুখ সব সমান। পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর লোক আছে, দুঃখবাদী ও সুখবাদী—দুঃখবাদী সব সময়ে জগতটাকে দুঃখের আগার, নরককুণ্ড ব'লে জানে। আবার সুখবাদীরা জগৎটাকে কেবল সুন্দর এবং সুখের স্থান বলে মনে করেন। কিন্তু ঠিক কর্ম্মযোগীর কাছে সব আনন্দময়—মঙ্গলময়ের ব'লে মনে হয়। এইটী কর্ম্মযোগের চরম কথা। কিন্তু এগুলি অভ্যাস ক'রতে হবে, তবেই আসবে সিদ্ধি। এই কর্ম্মযোগের সাধনা শ্রবণ, মনন, আচরণ ইত্যাদির দ্বারা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস ক'রতে হবে।

শিক্ষা অর্জ্জন ব্যাপারেও শিক্ষাকে আমরা অন্তরের থেকে লাভ করি, বাইরের শিক্ষা উদ্বোধক মাত্র। প্রকৃত শিক্ষকের কাছে শিক্ষালাভে প্রথমে প্রকৃত তত্ত্বসকলের অনুভব, পরে প্রবল ইচ্ছাশক্তি-রূপে পরিণত হয় তাদের সাধন ও অনুষ্ঠান। এবং এইভাবে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের একটী যন্ত্ররূপে পরিণতি। এতে যে জাতিই হও, ধর্ম্ম-পুস্তক পড় বা নাই পড়, দেবস্থানে না গিয়েও, সিদ্ধ হ'তে পারবে অপরকে সিদ্ধ ক'রতে সমর্থ হবে। জ্ঞান-ভক্তি, কর্ম্মযোগ-ভক্তিযোগ সকল যোগই এক এক উপায়।

---

(৭)

মুক্তি

স্বামিজী মুক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেছেন--ভারতীয় দর্শনে বলে কর্ম্মবিধানই সমস্ত জগৎ জুড়ে রাজত্ব করছে। আমরা বর্ত্তমানে যা কিছু দেখছি, অনুভব করছি অথবা যে কোন কাজ করছি, একদিকে সেগুলি আমাদেরি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলমাত্র—আবার এই বর্ত্তমানের কর্ম্মফলই ভবিষ্যৎ কর্ম্মের সূচনা করবে। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখলে বলা যায়—ঘটনাশ্রেণীর পুনরাবর্ত্তনের প্রবণতার নাম নিয়ম বা বিধি। কতকগুলি ঘটনা একটীর পর একটী অথবা একত্র সংঘটিত হ'লে আমাদের মনে দৃঢ় ধারণা হয়—ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে পুনঃ পুনঃ এটী ঘটবে। এটিকেই কার্য্যকরণ সম্বন্ধ বলে। অন্তর্জগতে যেমন বহির্জগতেও তেমনি। এই জগৎ

দেশ-কাল-নিমিত্তে গঠিত। নিয়ম কেবল এই জগতেই সীমাবদ্ধ। জগতের বাইরে কোন নিয়ম নেই। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎই নিয়মাধীন —বাইরে নিয়ম নেই। আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যতীত কোন বস্তুই কার্য্যকারণ নিয়মাধীন নয়। যখন কোন কিছু নাম-রূপের ছাঁচে পড়ে তখনই কার্য্যকারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। 'স্বাধীন ইচ্ছা' তত্ত্বপ্রসঙ্গে স্বামিজী ব'লেছেন—ইচ্ছা কি আমরা জানি, সবই জগতের অন্তর্গত। সেজন্য কার্য্যকারণ বিধির অধীন। অপরাপর শক্তিও এর ওপর কাজ ক'রে থাকে। আবার সেগুলিই পরে কারণ হয়। এইরূপে জগৎ চলে। কিন্তু মনুষ্য ইচ্ছারূপ ছাঁচে প'ড়ে ইচ্ছুক-রূপে পরিণত হয়। তৎপূর্ব্বে সে স্বাধীন ছিল ও কার্য্যকারণের ছাঁচের বাইরে গিয়ে আবার স্বাধীন হবে। এজন্য স্বাধীনতা মুক্তি হ'তেই আসছে, বন্ধনের ছাঁচে পড়ছে এবং পুনরায় স্বাধীনতায় ফিরে যাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—জগৎ কোথা হ'তে আসছে, কোথায় অবস্থান ক'রছে, কোথায় লীন হচ্ছে। এর উত্তরে স্বামিজী বলছেন—মুক্তি থেকে সৃষ্টির বন্ধনে বিশ্রাম আবার মুক্তিতেই জগতের লয়। সমগ্র সৃষ্টি, দেহ, মন, জগৎ, প্রকৃতি সব সেই বিরাট পুরুষের এক ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র। গীতার বাণী—'একাংশেন স্থিতো জগৎ।' এই কথায় আমাদের সমুদয় সুখ-দুঃখ, আশা-ভরসা, আনন্দ-বিষাদ সবই অতি ক্ষুদ্রের ভিতরে—এজন্য আমাদের এসবের চেষ্টা, স্বর্গলাভের বাসনা, কত ছেলেমানুষ কথা। মানুষ নিজের স্বরূপে হচ্ছে – সেই বিরাট চৈতন্যের অংশ। সে কথা সে ভুলে যায়। অতি দৈন্যবশতঃ বর্ত্তমান অবস্থা ছাড়া কিছুই চিন্তা করতে পারে না। কেবল প্রাণপণে তৃষ্ণাকেই অবলম্বন করে।

মুক্তিলাভ ক'রতে হলে এ সবেরই বাইরে যেতে হবে। দেহ মন, ইন্দ্রিয়, জগৎ, আশা-আকাঙ্খা, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ সবই ছাড়তে হবে, জগৎ-অতিরিক্ত হতে হবে--তবেই মিলবে প্রকৃত সত্য বস্তু। মানব-জীবনের চরম প্রাপ্তি মুক্তিলাভ করতে হ'লে যা কিছু ক্ষুদ্র সেটাকে ত্যাগ করতে হবে।

মুক্তিলাভের দু'টী পথ—নিবৃত্তিমার্গ, প্রবৃত্তিমার্গ। নিবৃত্তিমার্গ অতি কঠিন—নেতি নেতি বিচার নিরন্তর রেখে যেতে এবং সমুদয় জাগতিক তৃষ্ণা, ভোগ্য বস্তু, সব কিছুই ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু এ পথ অতীব কঠিন। আর প্রবৃত্তিমার্গে জাগতিক ভোগ রেখে ধীরে ধীরে বিচার ক'রে চললে, জাগতিক বস্তুর সত্যকার ক্ষণভঙ্গুর সত্ত্বা জানতে পারলে, তখন অনাসক্তি আসবে। আর তখনই এগুলি ছাড়তে পারবে। প্রথমটী জ্ঞানীর পথ আর দ্বিতীয়টী কর্ম্মযোগীর পথ। জ্ঞানী আত্মতৃপ্ত। কাজেই কর্ম্ম না করলেও চলে। কিন্তু জগতে এইরূপ শক্তিধর জ্ঞানী পুরুষ খুব দুর্লভ। তাই সাধারণের জন্যে কর্ম্মযোগ। আত্যন্তিকে এই জগতের সকলেই মুক্তি চাইছে। অণু-পরমাণু থেকে মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ, চন্দ্র সূর্য্য সকলেই চাইছে মুক্তি। তবে দীর্ঘকাল বিলম্বে এই মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু কর্ম্মযোগই শিখায় কর্ম্মের রহস্য, কর্ম্মের প্রণালী—কি করে অল্প পরিশ্রমে অধিক কার্য্য সম্ভব সেটী শেখায়। এই জগতে কর্ম্ম অবশ্যম্ভাবী—কাজেই খুব উচ্চতর আদর্শ সামনে রেখে কাজ ক'রে যেতে হয়। ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে।

কর্ম্মযোগ বলে—কর্ম্মে আসক্তি ত্যাগ কর, মনকে স্বাধীন রাখ। যা কিছু দেখছ ওগুলি অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার—কাজেই ওতে

বিচলিত বা মুগ্ধ হ'য়ো না। কর্ম্ম ক'রে যাও—কর্ম্মে বন্ধন হয় না। আসক্তিই বন্ধনের কারণ, এজন্য আসক্তি ত্যাগ কর। কোন কিছুতে আসক্ত, মোহগ্রস্ত হ'লেই বন্ধন। 'আমি' 'আমার' এই বোধ থেকেই দুঃখ-জ্বালা। স্বার্থ, আসক্তি, অহং-বোধ এ সবে মানুষ জগতে ক্রীতদাসে পরিণত হয় এবং নিরন্তর দুঃখভোগ করে—যেমন একটী সুন্দর ছবির দু'টী নকল ছবি—একটী আমার, অপরটী অন্যের। অপরের ছবিটী পুড়ে গেলে আমার দুঃখ হয় না কিন্তু আমার নিজের ছবিটী পুড়ে গেলে খুব দুঃখ হয়—কেন না, নিজেরটীতে আমি আসক্ত, বন্ধনগ্রস্ত এবং এজন্যেই দুঃখ। কর্ম্মযোগ বলে—ঘর সংসার সব কর, কিন্তু আমি ও আমার বোধ ছেড়ে কর, তবেই হবে মুক্তি। আসক্তি, স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ করতে পারলেই মনে আসে অসীম শক্তি ও মুক্তি। অবশ্য আসক্তি ত্যাগ অতি কঠিন।

এই আসক্তি ত্যাগের দু'টি পথ। একটী হচ্ছে, যারা ঈশ্বর মানে না, মনঃশক্তি সহায়ে চলেন তাদের। আর অপরটী ভক্তের। প্রথমটীতে ইচ্ছাশক্তি সহায়ে কৌশল বা উপায় অবলম্বন ক'রে জোড় ক'রে অনাসক্ত হ'বার নিরন্তর চেষ্টা—আর যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তাঁদের পক্ষে কর্ম্মযোগ সাধন আরো সহজ—তাঁ'রা যা' কিছু করেন, অনুভব করেন, শোনেন ইত্যাদি সবই শ্রীভগবানের জন্য। কোন ফল কামনা না রেখে—মান-যশ সমস্ত ভগবানে অর্পণ ক'রতে পারেন। ভক্তিমার্গে কর্ম্মযোগী নিজেকে আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র মনে করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরূপ কথা বলেন—মা তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র, আমি রথ তুমি রথী, আমি ঘর তুমি ঘরণী—যেমন করাও তেমনি করি—যেমন চালাও তেমনি চলি। গীতামুখে

শ্রীভগবান ব'লেছেন ঃ—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্॥

নিজেকে নিরন্তর ভগবানের যজ্ঞ কার্য্যে বলি দিতে হবে—অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় অহংকে আহুতি দিতে হ'বে।

শুভ, অশুভ. কল্যাণ, অকল্যাণ সবই ভগবানে সমর্পণ ক'রতে হবে। নিরন্তর অহং-আসক্তি ইত্যাদি ত্যাগের অভ্যাস রেখে গেলে রণক্ষেত্রের কোলাহলেও মন অবিচলিত থাকবে। জগতে যা কিছু তা আমাদের জন্য নয়—সবই ভগবানের জন্য সৃষ্ট।

কর্ত্তব্য-কর্ম্ম মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করে—কর্ত্তব্যবুদ্ধি গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় অন্তরাত্মাকে দগ্ধ ক'রে থাকে। অবশেষে অশ্বের ন্যায় লাগাম-জোড়া অবস্থায় মৃত্যু। বাস্তবিক কর্ম্মযোগীর আদর্শ কর্ম্ম হওয়া উচিত—অনাসক্ত হ'য়ে স্বাধীন পুরুষের ন্যায় করা, সমুদয় কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করা—এ অবস্থা লাভ কিন্তু খুব কঠিন।

লোকে অর্থচেষ্টা, কর্ম্ম-পরতন্ত্রতা বা আসক্তিজাত কর্ম্মকে কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়ে অনুষ্ঠান করে।

নীচ প্রকৃতির মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মানুষ্ঠান একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কর্ম্মযোগী কর্ত্তব্য উড়িয়ে দেবেন। এতে মানুষকে বাধ্যবাধকতার ভাব এনে আসক্ত ক'রে ফেলবে এবং এতেই আসবে বন্ধন। সমুদয় ঈশ্বরে সমর্পণ কর—পরস্পরের আশা রেখ না—নতুবা শান্তি পাবে না সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, লাভ-অলাভ সব ভগবানে অর্পণ কর্ম্মযোগীর আদর্শ। এই আদর্শ কর্ম্মযোগীর চেয়ে

অনেক মহাপুরুষও ছোট। তারপর অপেক্ষাকৃত অধিক রজঃশক্তি-শালী পুরুষগণ আসেন। তারা সিদ্ধপুরুষগণের ভাব গ্রহণ ক'রে জগতে ছড়ান। ঐতিহাসিক পরিচিত পুরুষ অপেক্ষা শান্ত নীরব ও অপরিচিত কর্ম্মীই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে সব মহাপুরুষ জগতে ধর্ম্মরাজ্য, নৈতিকরাজ্যে নাম ক'রেছেন তাঁরা তাঁদের পূর্ব্বতন নীরব নাম-না-জানা মহাপুরুষ বা শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীদের কৃত ভিত্তির ওপরেই ধর্ম্মপ্রাসাদ নির্ম্মাণ ক'রেছেন। একেবারে চরম অবস্থা যাদের লাভ হয়েছে, যাঁরা ঈশ্বরের নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করেছেন, অথবা যাঁরা আত্মতৃপ্ত, আত্ম-সন্তুষ্ট—তাঁরাই একমাত্র কর্ম্ম ক'রতে পারেন না; কিন্তু এই চরম অবস্থা ছাড়া প্রত্যেককেই কাজ ক'রতে হয়। কর্ম্মের মধ্যে অতি সামান্য এদিক ওদিক থেকেই যায়। তাই সেই চরম অবস্থার মহাপুরুষ ছাড়া প্রত্যেককেই কাজ করতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে লক্ষ লক্ষ বড়লোক পৃথিবী থেকে মৃত্যুর কিছুদিন পরই সকলের মন থেকে চিরতরে লুপ্ত হ'য়ে যায়—একমাত্র ভগবানের দৃষ্টি কোন কিছুকেই এড়ায় না। কাজেই সেই সর্ব্ব-শক্তিমান নিয়ত কর্ম্মশীল বিধাতার চরণে সমুদয় কর্ম্মফল অর্পণ ক'রে কর্ম্ম ক'রে গেলে, কর্ম্মই উপাসনা হ'লে, মিলবে পূর্ণ মুক্তি। এইটীই কর্ম্মরহস্য। বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত শক্তিই যাঁর আজ্ঞাধীন তাঁর শরণ নিয়ে আমাদের কর্ম্ম ক'রে যেতে হবে।

> ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ
> ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

—এখানে গীতার সঙ্গে মিল র'য়েছে।

যে বিভিন্ন উপায়ের দ্বারা আমরা সেই চরম অবস্থায় পৌঁছতে পারি—সেগুলির মধ্যে কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞানই প্রধান। কিন্তু এমন কথা ঠিক নয় যে এরা সম্পূর্ণ পৃথক সত্ত্বা। প্রত্যেকের ভিতর কিছু না কিছু সংমিশ্রণ আছে। কিন্তু যেখানে যেটী প্রধান সেটী সেই নামে আখ্যাত হয়।

এক্ষণে সেই চরম অবস্থা বা লক্ষ্যটী কি? তার উত্তরে স্বামিজী ব'লছেন সেটি হচ্ছে মুক্তি—অণুপরমাণু থেকে আব্রহ্মস্তম্ব প্রত্যেকেই চাইছে মুক্তি। জগতের প্রত্যেকটী যৌগিক অণুপরমাণু বস্তু চাইছে অপরের নিকট হ'তে পলায়ন করতে। কিন্তু অপরগুলি তাকে আবদ্ধ ক'রে রাখছে। জগৎ জুড়ে চ'লছে মুক্তির প্রয়াস। জগতে যত সৎ-অসৎ চিন্তা, যত গ্রহ, উপগ্রহ প্রাকৃতিক শক্তি, সকল কিছুর পিছনে র'য়েছে মুক্তির প্রয়াস। সাধু নিজেকে বন্ধনগ্রস্ত মনে ক'রে চাইছে আত্মিক মুক্তি—আবার চোরও তৎমুহূর্ত্তে কতকগুলি বস্তুর একান্ত অভাব থেকে মুক্তিলাভের জন্য চাইছে সেই বস্তুগুলির অভাব থেকে মুক্তি। এদের কেউ জ্ঞাতসারে, কেউ অজ্ঞাতসারে মুক্তির দিকে এগিয়ে চ'লেছেন—কিন্তু সাধুর সৎ উপেয় ও সৎ উপায়ের জন্য সাধু পায় অনির্ব্বচনীয় আনন্দ। কিন্তু চোর নিরন্তর বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে—অসৎ পথ্য ও পথের জন্য।

প্রত্যেক ধর্ম্মেই আমাদের মুক্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা। জগতের সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত নীতি— সবের লক্ষ্য মুক্তি। ক্ষুদ্র আমি হ'তে স্বার্থপরতা হ'তে চাই মুক্তি। অতি সামান্য মানুষ যখন ব্যক্তিগত অহং, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে তখন সে তৎমুহূর্ত্তে বিরাট শক্তিসম্পন্ন

হ'য়ে পড়ে। ক্ষুদ্র অহং ভূমায় পরিণত হয়। নিঃস্বার্থ কর্ম্ম দ্বারা মানব-জীবনের চরমাবস্থা এই মুক্তিলাভ করাই কর্ম্মযোগ।

কোন্‌টী ঠিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এটী সঠিক বলা মুস্কিল। কেন না, দেশ, কাল, পাত্র ভেদে কর্ত্তব্য বিভিন্ন হ'য়ে যায়। একটী দেশে যেটী পুণ্য কর্ম্ম বলে বিবেচিত, অপর দেশে সেইটিই একান্ত গর্হিত কর্ম্ম বলে গণ্য হয়—কাজেই সঠিক নির্দ্দেশ দেওয়া কঠিন। কিন্তু সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বপাত্রের পক্ষে একমাত্র নিঃস্বার্থ হ'য়ে যে কোন কাজই ন্যায়সঙ্গত বা কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বলে নির্দ্ধারিত হ'তে পারে। ধর্ম নীতি সব ক্ষেত্রেই এই এক কথা। নিজের অহং-বোধ অহং-অভিমান যদি অনেক পরিমাণে চ'লে যায় তাহ'লে তিনি ভগবানে বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন, আত্মিক অনুসন্ধান করুন বা নাই করুন কেবল নিঃস্বার্থ কর্ম্ম দ্বারাই সকল সমস্যার সমাধান করেন।

এখন প্রশ্ন, এই যে কর্ম করা—এই কর্ম কি? জগতের উপকার যদি বলা যায় তাহ'লে উপকারটিই বা কি? কেন না, কোন মানুষই জগতের কোন চিরস্থায়ী উপকার ক'রতে পারে না। যে কোন রকম চাহিদাই মেটাও, কয়েকদিন বাদেই আবার চাহিদা আসবে। সমুদ্রের একস্থানে তরঙ্গ ওঠাতে গেলে আর এক স্থানে নেমে যাবেই। জগতের শক্তিরাশি সমান। বর্ত্তমান জগতে এত শিক্ষা সভ্যতা, তথাপি সেই সুখী-দুঃখী, ধনী-দরিদ্র, মূর্খ-শিক্ষিত প্রভৃতির পার্থক্য র'য়েই গেছে। যুগ পরিক্রমায় মানুষের চিরন্তন চেষ্টা, সমাজ থেকে দুঃখ কমিয়ে সুখের আধিক্য বিস্তার করা। কিন্তু সে চেষ্টাও একেবারে অনর্থক। অতএব দেখা যাচ্ছে আমরা জগতের সুখ-দুঃখ কিছুই বৃদ্ধি ক'রতে পারি না। জীবন অর্থেই

নিয়ত মৃত্যু, নিয়ত জোয়ার-ভাটা, ওঠা-নামা জগতের স্বভাব। একটি আলো ক্রমাগত জ্বলে ক্ষয় হচ্ছে, ঐটিই আলোর জীবন। জীবন প্রার্থনা করলেই মৃত্যু প্রার্থনা ক'রতে হবেই। উত্থান-পতন, জন্ম-মৃত্যু এক অখণ্ড বস্তুরই দুটো দিক। কেউ মৃত্যু-চিন্তা ক'রে দুঃখবাদী—কেউ জীবন-চিন্তায় সুখবাদী।

অনেকেই মনে করেন সাম্যবাদ জগতের কল্যাণের কারণ। খৃষ্টধর্ম্মও এই সাম্যের আশা দেখিয়ে খৃষ্টধর্ম প্রচার ক'রেছিলেন। কিন্তু এই সাম্যভাব জগতে কখনও আসে নি—আসবেও না। মহাপ্রলয়েই জগৎ সাম্যের মধ্যে থাকে। কিন্তু বৈষম্য থেকেই সৃষ্টি। বিরোধ, প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সকল শক্তির সৃষ্টি। জগতের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু পূর্ব্ব সাম্যের মধ্যে ফিরে যেতে চাইছে—আবার বৈষম্যে আসছে। বিরোধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বৈষম্য ইত্যাদি আছে ব'লেই জগৎটা আছে। মস্তিষ্কের গঠনের বৈচিত্র্য আছে ব'লেই বিভিন্ন মানুষের বৈচিত্র্য—বিভিন্নতা আছে ব'লেই জগৎ। আবার ঈশ্বর সন্নিধানে থাকা ও মুক্তিলাভের চেষ্টা না থাকলেও সৃষ্টি থাকত না।

এই জগৎ চক্রবৎ—চক্রের ভেতর চক্র, হাত দিলেই বিপদ। দুটি উপায় আছে—একটি যন্ত্রের সংস্রব ছেড়ে দেওয়া আর ওটিকে চল্‌তে দেওয়া। সব বাসনা ত্যাগ করা কিন্তু খুব কঠিন। অপর উপায় জগতে ঝাঁপ দিয়ে কর্ম-রহস্য জেনে নেওয়া। এইটি কর্মযোগ। কর্মের দ্বারাই কর্মের বাইরে যাওয়া শিখতে হবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে আমরা দেখলুম—কর্ম সর্ব্বদাই চলবে এবং আস্তিক্যবাদীরা সহজেই বুঝতে পারবেন, ঈশ্বর পরমুখাপেক্ষী

নয়, কর্ম কেবল নিজের কল্যাণের জন্য। দ্বিতীয়তঃ, মনে রাখতে হবে—জগৎ, কর্ম. সবই চিরকাল থাকবে এবং আমাদের চরম লক্ষ্য হবে মুক্তি—এইজন্যই চাই মুক্তি। কিন্তু অভিসন্ধি রেখে কর্মে কখনও মুক্তিলাভ হয় না—এমন কি স্বর্গলাভ ইচ্ছাও অভিসন্ধিযুক্ত এবং বন্ধন আনে। গীতার কথায়ই এখানে স্বামিজী পুনরুত্থাপন ক'রেছেন—'মা ফলেষু কদাচন।'

অতএব একমাত্র উপায় অনুশোচ হ'য়ে, নিঃস্বার্থ হ'য়ে অনাসক্তির সঙ্গে কর্ম্মানুষ্ঠান এবং ভগবানে ফল সমর্পণ। অনাসক্ত হ'য়ে কাজে একটি একটি করে বন্ধনের মুক্তি আনবে—পবিত্রতম ক'রবে। অনেকে বলেন যে, অনাসক্ত কাজ একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু তাঁরা গোঁড়ামির দ্বারা কাজ করেন ব'লে এইরূপ বলেন।

স্বামিজী বুদ্ধদেবকেই একমাত্র আদর্শ কর্ম্মযোগী ব'লে গ্রহণ করেছেন। আর অন্যান্যেরা অবতার, প্রেরিত বা স্বয়ং অবতার ব'লেছেন। কাজেই তাদের কাজে নৈতিক ও ধর্ম্মীয় উন্নতি হ'লেও বহির্জগত হ'তে আশা রেখে কাজ করেছিলেন। কিন্তু একমাত্র বুদ্ধই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মী, তিনি কোন প্রত্যাশা না রেখে কাজ করেছিলেন—অনেক বেশী কাজ করেছিলেন। তিনি হৃদয় ও মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য করেছিলেন। বুদ্ধদেব ব'লেছেন—কোন প্রাচীন পুঁথিতে কিছু লেখা আছে ব'লে কোন কিছু বিশ্বাস ক'রো না; নিজে বিশ্লেষণ ক'রে দেখে তবে বিশ্বাস ক'রো ও অপরকে দাও। অভিসন্ধিহীন মানুষের কাজই কর্ম্মযোগের চরম আদর্শের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হবে।

রাজযোগ

কথামৃত মুখে শ্রীঠাকুর ব'লেছেন—

নিক্তির একদিকের ভার বেশী হ'লে উপরের কাঁটা ও নীচের কাঁটার মুখ এক হয় না। উপরের কাঁটা ঈশ্বর, নীচের কাঁটা মানুষের মন। এই দুই কাঁটা এক হওয়ার নামই যোগ।

পরমাত্মা চুম্বক পাথর, জীবাত্মা যেন একটি ছুঁচ। তিনি টেনে নিলেই যোগ।

কামিনী কাঞ্চনই মায়া। মন থেকে দু'টী গেলেই যোগ।

স্বামিপাদের মতে যোগ মানে যুক্ত করা—অর্থাৎ জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন ক'রে দেওয়া।

রাজযোগ সত্যলাভের প্রকৃত কার্য্যকরী ও সাধনোপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সিদ্ধ।

যথার্থ-ই এই যোগ একটি মহাবিজ্ঞান। যতক্ষণ নিজের কিছু না প্রত্যক্ষ হয় ততক্ষণ কিছু বিশ্বাস করা এটী রাজযোগের অভিপ্রেত নয়।

ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যে সত্য লাভ করি আমাদের তার চেয়ে উচ্চতর সত্য লাভ হ'তে পারে ও এই প্রমাণ দিতেই রাজযোগ কৃত-সংকল্প। রাজযোগী বলেন যোগের নির্দ্দিষ্ট সাধন প্রণালী অনুসারে সাধন ক'রলে নিশ্চয় আলোক আসবে।

প্রায় চার হাজার বছর আগে এই যোগ আবিষ্কৃত হয়, সেই সময় থেকে ভারতেই ইহা প্রণালী বদ্ধ হয়ে বর্ণিত ও প্রচারিত হচ্ছে।

মনের ভিতর কখন কি হচ্ছে, এ বিষয়ে যতক্ষণ না সঠিক জানতে পারি ততক্ষণ আমাদের মন সম্বন্ধে বা প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুই অধিগত হয় না।

বাহ্য জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করা সহজ এবং এই পর্য্যবেক্ষণের অনেক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে—কিন্তু অন্তর্জগতের ব্যাপার জানবার কোন যন্ত্র তেমন নেই। কিন্তু এই রাজযোগ আমাদের নিজের আভ্যন্তরীণ পর্য্যবেক্ষণের উপায় ব'লতে সক্ষম। বহির্জগতে মনোনিবেশ ক'রে ক'রে আমরা অন্তর্জগতের পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। সেইজন্য এখন নতুন ক'রে নিজের স্বভাব বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য মনে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ আমাদের বিশেষ শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজযোগ সাধনা কিছুটা শরীর সংযম আর বাকীটা মনঃসংযমাত্মক। হঠযোগে শুধু দেহের সুস্থতা ও দীর্ঘজীবন লাভই উদ্দেশ্য। আর রাজযোগের উদ্দেশ্য ভক্তি প্রেম জ্ঞান বৈরাগ্য (শ্রীঠাকুর)। শরীরের সুস্থতায় মন সুস্থ ও সতেজ থাকে। আবার কোন ব্যক্তি যখন ক্রোধান্বিত হয় তখন তার মন অস্থির হয়, মনের অস্থিরতার জন্য শরীরও সম্পূর্ণ অস্থির হ'য়ে পড়ে।

আমাদের দেহ ও মনকে নিগ্রহ করবার ক্ষমতা খুব কম। তাই মনের উপর এই ক্ষমতা বা শরীরের উপর এই ক্ষমতা বিস্তারের জন্য কতকগুলো বহিরঙ্গ সাধন বা দৈহিক সাধনের প্রয়োজন। এইভাবে শরীর যখন নিজের আয়ত্তে আসবে তখনই আসবে মনের উপর ক্ষমতা প্রয়োগের সময়। তারপর যখন মন কিছুটা বশীভূত হবে তখনই আমরা পারব মনকে ইচ্ছামত চালাতে বা মনের বৃত্তিসমূহকে একমুখী করতে।

রাজযোগীর মতে এই সমস্ত বহির্জগৎ, অন্তর্জগৎ বা সূক্ষ্ম জগতের কারণ। এই হিসাবেই স্থূল জগতে পরিদৃশ্যমান শক্তিগুলি আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্মতর শক্তির স্থূল ভাগ মাত্র। এই আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলিকে যিনি ইচ্ছামত চালনা ক'রতে সক্ষম তিনি সমস্ত প্রকৃতিকে জয় ক'রতে পারেন।

এই প্রকৃতিকে জয় ক'রতে এক এক জাতির মাঝে এক এক রীতি প্রচলন।

রাজযোগ সাংখ্যের উপর উপস্থাপিত। সাংখ্যদর্শনের বিষয় জ্ঞান। প্রথমে ধর বিষয়ের সঙ্গে চক্ষুরাদি যন্ত্রের সংযোগ—চক্ষু সব ইন্দ্রিয়গণের কাছে পাঠায়—ইন্দ্রিয়সকল মনের কাছে, মন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির কাছে। তখন পুরুষ বা আত্মা তা গ্রহণ করে। তারপর আবার তারা আত্মার আদেশে স্ব স্ব পথে সব ফিরে যায়। এই পুরুষ বা আত্মা ভিন্ন আর সমস্ত জড়—তবে মন এদের চেয়ে সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত। মন যে উপাদানে গঠিত তা ক্রমশঃ স্থূলতর হ'য়ে তন্মাত্রার সৃষ্টি হয়। আরো স্থূল হ'লে পরিদৃশ্যমান ভূতের হয় উৎপত্তি।

বুদ্ধি ও স্থূল ভূতের মধ্যে প্রভেদ শুধু মাত্রার তারতম্যে।

মন যেন পুরুষের বাহ্য বিষয় গ্রহণকারী যন্ত্রস্বরূপ।

সে কখনও সব ইন্দ্রিয়ে, কখনও বা একটিতে, কখনও বা কোনোটিতে নয় এমনি ভাবে, ছুটোছুটী করে।

যেমন যখন মন দিয়ে কোন শব্দ শুনি তখন চেয়ে থাকলেও কিছু দেখতে পাব না। অর্থাৎ তখন মন শ্রবণেন্দ্রিয়ে ছিল, দর্শন ইন্দ্রিয়ে ছিল না। কোন সময়ে সব ইন্দ্রিয়তেই একসঙ্গে থাকতে পারে।

মনের আর একটা ক্ষমতা, সেটী হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টি। শরীর-তত্ত্ববিৎরাও বলেন, চক্ষু দর্শনের করণ নয়—করণ হ'চ্ছে মস্তিষ্কের অন্তর্গত স্নায়ুকেন্দ্র। এমন কি সব ইন্দ্রিয়েরই কেন্দ্র মস্তিষ্কে। তাঁরা এও বলেন—মস্তিষ্কের যে উপাদান, ইন্দ্রিয়েরও সেই উপাদান।

তবে সাংখ্যের সঙ্গে শরীর-তত্ত্ববিৎদের পার্থক্য, একটা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে আর একটা ভৌতিক দিক দিয়ে।

রাজযোগী বলেন—যোগী নিজেকে এমন সূক্ষ্মশক্তিসম্পন্ন ক'রবেন যে চক্ষু গোলক আঘাত পেলে তাতে সৃষ্ট সেই বেদনা কেমন করে করণ সাহায্যে স্নায়ুকেন্দ্রে যায়, মন কেমন ক'রে তা গ্রহণ করে এবং কেমন ক'রে তা আবার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে পৌঁছায় ও পরিশেষে কেমন ক'রে পুরুষের কাছে এগুলি যায়—তা আলাদা আলাদা ভাবে যোগী দেখতে সক্ষম হবেন।

যে কোন বিজ্ঞান শিক্ষা করো না কেন, প্রথমে আপনাকে তার জন্য তৈরী ক'রতে, এক নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর অনুসরণ ক'রতে হবে। সাধনের প্রথম অবস্থায় ভোজন বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে—যাতে মন পবিত্র থাকে এমনি আহার চাই। পরে অবশ্য এতটা সাবধান না হ'লেও চ'লবে। এ যেন ছোট চারাগাছ রক্ষা ক'রতে বেড়া দেওয়ার মত।

যোগীরা অধিক বিলাস ও কঠোরতা পরিত্যাগ ক'রবে। গীতাকার বলেছেন—যিনি আপনাকে অধিক কষ্ট দেন তিনি কখনও যোগী হ'তে পারেন না।

নাত্যশ্নতস্তু যোগঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন।
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।

অতি ভোজন, উপবাসশীল, অধিক জাগরণশীল, অধিক নিদ্রালু, অতিরিক্ত কর্ম্মী অথবা একেবারে নিষ্কর্ম্মা—ইহাদের মধ্যে কেউই যোগী হ'তে পারে না।

---

(২)

অষ্টাঙ্গ যোগযুক্ত এই রাজযোগ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি।

যম অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ। নিয়ম অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, স্বাধ্যায়, তপস্যা, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। যম ও নিয়ম হচ্ছে চরিত্র গঠনের ভিত্তিস্বরূপ; এ দুটীতে প্রতিষ্ঠা এলে, যোগীর সাধনের ফল প্রত্যক্ষ হ'তে সুরু হয়।

যোগী কায়মনোবাক্যে মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীর হিংসা ক'রবে না; তার দয়া হবে সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত।

এর পর আসন—বহুক্ষণ একভাবে বসা যায় এমন একটি সরল ও ঋজু আসনের অভ্যাস। আসনে সিদ্ধ হ'লে নাড়ীশুদ্ধি।

রাজযোগে না থাকলেও স্বামিপাদ ব'লেছেন, যখন শঙ্করাচার্য্য নিয়েছেন তখন আমরা এর উপকারিতা গ্রহণ ক'রলুম।

'প্রথমং নাড়ী শোধনং কর্ত্তব্যং।' (২য় অ ৮ শ্লোক, শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, শঙ্করভাষ্য)।

এর পর সাধনা। বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ডান নাক বন্ধ ক'রে বাঁ নাকে বায়ু গ্রহণ ও মুহূর্ত্ত বিশ্রাম না ক'রে বাঁ নাক বন্ধ ক'রে ডান নাক দিয়ে বায়ু ত্যাগ ক'রতে হবে। এই অভ্যাস দিনে চারবার—ভোরে, দুপুরে, সন্ধ্যায়, রাত্রিতে। পনর দিন কি মাস-খানেকের মধ্যে নাড়ীশুদ্ধি হ'লো। 'অতঃ প্রাণায়ামঽধিকারঃ।' অর্থাৎ এর পর প্রাণায়ামের অধিকার এল। এই সাধন নিরন্তর অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। আবার সাধনের ক'টী বিঘ্নও আছে—প্রথম রোগগ্রস্ত দেহ, দ্বিতীয় সন্দেহ।

যথাযথ যোগাভ্যাসের অল্পদিনের মধ্যেই দূর দর্শন, দূর শ্রবণ এই সব লোকাতীত ব্যাপার সুরু হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এর কোন বিশেষ মূল্য নেই, শুধু সাধকের কিছু বিশ্বাস এনে দেওয়া ছাড়া। সাধনের একমাত্র লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আত্মার মুক্তি। সামান্য সিদ্ধিতে খুসী হ'লে চলবে না। আমাদের প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব আনতে হবে ও জানতে হবে, শরীর আমার—আমি শরীরের নই।

নদীর ঢেউয়ের মত শরীর পরিবর্ত্তনশীল হ'লেও একে কিছু সুস্থ সবল রাখতে হবে—কারণ এরই দ্বারা জ্ঞানলাভ ক'রতে হয়।

সর্ব্ব প্রকার দেহের মধ্যে মানব-দেহ শ্রেষ্ঠ। এমন কি দেবতাদেরও জ্ঞানলাভের জন্য এই মানব-দেহ গ্রহণ ক'রতে হয়। কিন্তু আমরা এ হেন শরীর সম্বন্ধে কিছুই জানি না। এর কারণ—মনকে আমরা এমন একাগ্র ক'রতে পারি না, যাতে শরীরের সূক্ষ্ম গতিগুলি বুঝতে পারি।

বাহ্যবিষয় ছেড়ে মন যখন দেহের ভিতর প্রবেশ ক'রবার সূক্ষ্মাবস্থা লাভ করে তখনই তো আমরা শরীরাভ্যন্তরের গতিবিধি জানতে পারি।

এ সূক্ষ্ম অনুভূতিযুক্ত হ'তে হ'লে কিন্তু প্রথম থেকেই স্থূল-সাধন আরম্ভ ক'রতে হবে।

এখন দেখতে হবে শরীরের গতিবিধি চালনা ক'রছেন কে?

তিনিই প্রাণ।

শ্বাস-প্রশ্বাস হ'চ্ছে প্রাণশক্তির দৃশ্যমান রূপ বা সত্ত্বা। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে শরীরের ভিতর ঢুকলে তবেই আমরা জানতে পারব স্নায়বীয় শক্তি-প্রবাহগুলি কেমন ক'রে সারা শরীরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। যখনই আমাদের এই অনুভব ক্ষমতা আসবে তখনই আমাদের এই শক্তি-প্রবাহগুলি ও দেহ বশে আসবে। কাজেই ঐ শক্তি-গুলিকে জয় ক'রতে পারলে মনও আমাদের বশে আসবে। শরীর মধ্যস্থ স্নায়ুগুলির ভিতর যে শক্তিপ্রবাহ, তাদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন। এইজন্য আবার কঠোর অভ্যাসের দরকার। প্রাতে ও সন্ধ্যায় দিনে দু'বার ক'রে সাধন করতে হবে। সাধনের আগে কিন্তু কিছু খাবে না। ধূপ-ধূনায় সুগন্ধময় একটি নির্দ্দিষ্ট ঘর রাখবে। সেই ঘরে কাপড় না ছেড়ে ঢুকবে না। সেই ঘরে বাজে কথা বা বাজে চিন্তা ক'রবে না—বাজে লোক ঢুকতে দেবে না।

যদি ঘর না থাকে তবে আসনে বসেই প্রথমে সকলে সুখী হোক্, শান্তি পা'ক্, সকলে স্বাস্থ্যলাভ করুক- ঈশ্বরের কাছে এইরূপ প্রার্থনা ক'রে একটি পবিত্র প্রবাহের সৃষ্টি ক'রবে; তারপর ব'লবে

আমার দেহ সুস্থ হোক্‌, বজ্র-দৃঢ় হোক্‌, এই দেহই আমার মুক্তির সহায়, আর ব'লবে মন তুমি অনন্ত শক্তিধর।

---

(৩)

এইবার সাধন আরম্ভ—প্রাণায়াম সাধনে সিদ্ধিলাভ করবার অনেক রকমের উপায় আছে, তার মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া একটি উপায়।

প্রাণায়াম সাধন মানে প্রাণেরই সংযম সাধনা। ভারত দার্শনিকরা বলেন, এই বিশ্ব-চরাচর মাত্র হু'টি পদার্থে তৈরী—একটির নাম আকাশ, অপরটি প্রাণ।

এই আকাশই বায়ুরূপে রূপান্তরিত হয়। এই আকাশ হ'তেই কঠিন পদার্থ, সূর্য্য, পৃথিবী, তারা, ধূমকেতু, কীট, পতঙ্গ, পশু, পাখী, মানুষ শরীর, উদ্ভিদ্‌, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আমরা যা কিছু দেখি বা যে বস্তুগুলি আমরা অনুভব করি, এমন কি জগতের সমস্ত বস্তুই, সৃষ্ট হয়।

অথচ এই আকাশকে আমরা আলাদা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব ক'রতে পারি না, ইহা এত সূক্ষ্ম যে, সাধারণের অনুভূতির বাইরে।

সৃষ্টির প্রথমে একমাত্র এই আকাশ—কল্পান্তে আবার কঠিন তরল সবই আকাশেই লয় প্রাপ্ত হয়।

আবার পরবর্ত্তী সৃষ্টি এই আকাশ হ'তে উদ্ভব। কিন্তু কোন শক্তিতে আকাশ এইভাবে বার বার জগতরূপে সৃষ্ট হচ্ছে? সেই শক্তিই প্রাণশক্তি।

আকাশ যেমন বিশ্বের কারণীভূত অনন্ত সর্ব্বব্যাপী মূল উপাদান, তেমনি প্রাণও জগৎ উৎপত্তির কারণীভূত। অনন্ত সর্ব্বব্যাপিনী প্রকাশিনী শক্তি।

সৃষ্টির প্রথমে ও শেষে সব কিছুই আকাশরূপে পরিণত হয়, আর জগতের সব শক্তিই প্রাণেই বিলয়প্রাপ্ত হয়। কল্পান্তে আবার প্রাণ হ'তেই সব সৃষ্ট হয়। এই প্রাণই গতিরূপে, মাধ্যকর্ষণরূপে, চৌম্বকাকর্ষণরূপে প্রকাশিত। এই প্রাণই স্নায়বীয় শক্তি-প্রবাহরূপে দৈহিক ক্রিয়ারূপে, চিন্তাশক্তিরূপে প্রকাশিত।

বাহ্য ও অন্তরের সব শক্তি যখন তাদের আদি অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখনই সে প্রাণ।

আকাশ যখন গতিশূন্য ছিল তখন প্রাণের কোন প্রকাশ না থাকলেও কিন্তু প্রাণের অস্তিত্ব ছিল।

আধুনিক বিজ্ঞান বলেন—জগতের যত কিছু শক্তি প্রকাশিত তারা সমষ্টিগত হ'য়ে চিরকাল সমান থাকে; ঐ শক্তি কল্পান্তে শান্তভাবে থাকে বা অব্যক্তে গমন করে। পর সৃষ্টির আদিতে তারাই আবার ব্যক্ত হয়ে আকাশের উপর কাজ করে।

প্রাণের সঠিক তত্ত্ব জানা আর প্রাণকে সংযত করার চেষ্টাই প্রাণায়ামের প্রকৃত উদ্দেশ্য। প্রাণায়ামে সিদ্ধিলাভ হ'লেই যেন যোগীর কাছে অনন্ত শক্তির দরজা খুলে যায়। যে প্রাণশক্তিকে জয় করেছে তার আদেশে চন্দ্র সূর্য্য স্থানচ্যুত হয়, দেবতারাও আহ্বানমাত্র আসেন, মৃতব্যক্তিকে ডাকলেই আসবে, মোট কথা প্রকৃতির সমস্ত শক্তিই আজ্ঞামাত্র কাজ ক'রবেন। এক কথায় তিনি সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ হন। হিন্দুদের এইটিই বৈশিষ্ট্য—

তাঁরা সর্ব্বজ্ঞ হ'তে চান না, তাঁরা চান "কস্মিন্ন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি ?" (মুং উঃ ১।৩) এমন কি বস্তু আছে যা জানলে সব জিনিষই জানা যায় ?

আমাদের সব চেয়ে কাছে দেহ, তার থেকেও কাছে মন, তার থেকে কাছে প্রাণ-তরঙ্গ।

কেউ যদি এই দেহভ্যন্তরের ক্ষুদ্র প্রাণ-তরঙ্গকে জানতে পারে তবে সমস্ত প্রাণশক্তিকে সে জানতে পারবে। সিদ্ধ যোগীকে সেইজন্যই বলে সর্ব্বশক্তিমান।

প্রত্যেক সম্প্রদায়েই কোন না কোন উপায়ে প্রাণ জয়ের চেষ্টা চ'লছে—যেমন আমেরিকায় মনঃশক্তি দ্বারা আরোগ্যকারী, বিশ্বাসে আরোগ্যকারী, প্রেততত্ত্ব, খৃষ্ট-বিজ্ঞানবিদ্, বশীকরণ তত্ত্ববিদ্, সব সম্প্রদায়ই—তারা জানুক বা না জানুক—সকল মতেরই মূলে আছে প্রাণায়াম।

যে প্রাণ সব প্রাণীর ভিতরেই র'য়েছে তার সূক্ষ্মতম ও উচ্চতম অভিব্যক্তই মনোবৃত্তি। এই মনোবৃত্তি অনেক রকমের, প্রথম সহজাত জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞান-বিরহিত চিত্ত। (Instinct) যেমন একটী মশা কামড়ালে, অমনি হাত উঠল তাকে মারতে। এতে কোন চিন্তার দরকার হোল না, কাজটী আপনিই গেল। একে বলে Reflex action এর থেকে উচ্চতর আর এক মনোবৃত্তি আছে যাকে জ্ঞান-পূর্ব্বক বা সজ্ঞান মনোবৃত্তি (Conscious) বলে।

যোগীরা বলেন, জ্ঞান-বিরহিত জ্ঞান ও সজ্ঞান জ্ঞান ছাড়িয়েও মন আরো উচ্চ ভূমিতে বিচরণ ক'রতে পারে। তাকে জ্ঞানাতীত, পূর্ণ চৈতন্য ভূমি বা সমাধি বলা হয়।

কি বহির্জ্জগৎ কি অন্তর্জ্জগৎ যে দিকেই চাইবে দেখবে এক অখণ্ড বস্তুরাশি। বৈজ্ঞানিকের কাছে গেলে তিনিই এইটী তোমাকে বুঝিয়ে দেবেন যে একের সঙ্গে অপরের ভেদ শুধু কথা। প্রত্যেক সাকার বস্তুই যেন অনন্ত জড় সাগরের আবর্ত্ত স্বরূপ। মনো জগৎ সম্বন্ধেও একই কথা। সমস্ত মনও এক অখণ্ড স্বরূপ।

যিনি মনের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম কম্পন সৃষ্টি ক'রতে পারেন তিনিই দেখতে পান সমস্ত জগৎ শুধু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কম্পনের কতকগুলো সমষ্টি মাত্র। যখন আমরা অন্তর বা বহির্জ্জগৎ ছেড়ে আত্মার কাছে যাই তখন সেখানে এক অখণ্ড সত্য ছাড়া আর কিছুই অনুভব করি না।

সমস্ত গতির অন্তরালে অখণ্ড এক সত্ত্বা। দৃশ্যমান গতির মধ্যে ও শক্তির প্রকাশগুলির মধ্যেও সেই অখণ্ড ভাব স্বমহিমায় বিরাজ-মান ও বিদ্যমান।

এই শক্তিরূপী প্রাণ-সংযোগই প্রাণায়াম নামে অভিহিত। ফুস-ফুসের গতিবেগই প্রাণের প্রকাশ। ফুসফুসের কাজই যন্ত্র-মধ্যস্থ গতিগুলিকে চক্রস্বরূপে অপর শক্তিতে চালনা করা। কাজেই বুঝা গেল প্রাণায়ামের প্রকৃত অর্থ শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া নয়—ফুসফুসের গতিরোধ করা।

যে শক্তি স্নায়ুগুলির ভিতর দিয়ে মাংসপেশীর কাছে যাচ্ছে ও যে ফুসফুসকে চালনা ক'রছে সেইটীই প্রাণশক্তি।

প্রাণ জয়ী হ'লে যোগীর সুখ, দুঃখ, ব্যাধি সবই ইচ্ছাধীন হয়। এমন কি অপরের দেহ মনের উপর ক্ষমতা প্রকাশের শক্তি হয়। তার কাছে দূরত্ব ব'লে কোন পদার্থ থাকে না। ক্রম-বিচ্ছেদ ব'লে

কিছু নাই। এক অবিচ্ছিন্ন বস্তুই বর্ত্তমান। তুমি তার অংশ। সূর্য্যও তার অংশ। নদীর কি 'এক দেশ' ও 'আর এক দেশ' ব'লে ক্রম-বিচ্ছেদ হয়? তবে অখণ্ড শক্তিরই বা হবে কেন? জগতে যত রকমের তেজের প্রকাশ আছে সব প্রাণ সংযোগের দ্বারা লভ্য হয়। শরীরের যেখানটাতে প্রাণশক্তির অপূরণতা, সেইটী যোগীরা বুঝতে পারেন ও সঙ্গে সঙ্গে সেখানটী প্রাণশক্তিতে পূরণ ক'রে রোগ আরোগ্য করেন। যেমন বাষ্পের মধ্য দিয়ে বাষ্পীয় যন্ত্রকে চালনা করা বাষ্পশক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ তেমনি প্রাণের সংযম ও তাঁদিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চালনা করাই রাজযোগের লক্ষ্য। আর আত্মার উন্নতির সংবেগ বাড়িয়ে কেমন ক'রে খুব অল্প সময়ের মধ্যে মুক্তি লাভ করা যেতে পারে সেটিও রাজযোগের লক্ষ্য। যখনই কোন সম্প্রদায় অতীন্দ্রিয়ের ও গুপ্তুতত্ত্ব প্রকাশের চেষ্টা ক'রছে তখনই বুঝতে হবে তাঁরা কিছু না কিছু যোগের সাধনা ক'রছেন। যোগীরা মনকে ভিন্ন ভিন্ন স্পন্দন-বিশিষ্ট ক'রে অপরাপর স্তরের খবর আনতে পারেন।

যে প্রাণায়ামে প্রাণের স্থূলরূপগুলো বাহ্যিক উপায়ে জয় করা যায় তাই পদার্থ বিজ্ঞান। যে প্রাণায়ামে প্রাণের আধ্যাত্মিক বিকাশকে আধ্যাত্মিক উপায়ে সংযমিত করার চেষ্টা তাই রাজযোগ।

---

(৪)

মেরুদণ্ডের মধ্যে বামে ইড়া ও দক্ষিণে পিঙ্গলা নামে হু'টি শক্তি প্রবাহ আছে। আর মেরুদণ্ডের মজ্জা মধ্যে সুষুম্না বলে একটি শূন্যনালী আছে। এই শূন্য নালী সুষুম্নার নিম্নদেশে ত্রিকোণাকার

কুণ্ডলিনী শক্তি। কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা হ'য়ে যখন শূন্য নালী দিয়ে ক্রমশঃ উপরে উঠতে থাকেন তখন সাধকের মনের স্তর একটির পর একটী ক'রে খুলে যায়। তখনই অলৌকিক দর্শনাদি ও অসাধারণ শক্তি লাভ হয়। কুণ্ডলিনী শক্তি একেবারে যখন মস্তিষ্কে পৌঁছান তখনই যোগী পরিপূর্ণভাবে মন ও দেহ হ'তে আলাদা হন বা আত্মার মুক্ত ভাব জ্ঞাত হন।

এই সুষুম্নার মুখ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হ'য়ে কটিদেশস্থ স্নায়ুর কাছ অবধি এসে একেবারে রূদ্ধ হ'য়ে যায়। ঐ স্নায়ুজালকে যোগীরা পদ্ম-স্বরূপ বলেন। ইড়া পিঙ্গলার মধ্যে দু'টি শক্তি প্রবাহ—একটী জ্ঞানাত্মক, একটী গত্যাত্মক—একটী বহির্মুখী, একটী অন্তর্মুখী, একটী কেন্দ্রাভিমুখী, একটী কেন্দ্রাপসারী। একটী মস্তকে সংবাদ প্রেরণ করে, আর একটী মস্তিষ্ক থেকে সারা-অঙ্গে পৌঁছে দেয়।

পদার্থ বিজ্ঞানের তড়িৎ-তত্ত্বও এক প্রকার গতি বিশেষ।

সমস্ত পরমাণুগুলি একযোগে একদিকে গতিশীল হ'লে তা'তেই বৈদ্যুতিক শক্তির সৃষ্টি হয়।

কোন গৃহের বায়ুরাশি যদি তার সমস্ত পরমাণুগুলোকে প্রতিক্ষণই একদিকে সঞ্চালিত করে তবে সেটী একটী মহা-বিদ্যুৎ-আধার বা (ব্যাটারী) যন্ত্ররূপে পরিণত হয়।

তেমনি শরীরস্থ সমস্ত গতি প্রবাহ একমুখীন হ'য়ে ইচ্ছা-শক্তিরূপে তীব্র বিদ্যুৎ-আধারস্বরূপ হয় বা (ব্যাটারী) সৃষ্টি করে।

এই সুতীব্র ইচ্ছাশক্তি লাভই যোগীর উদ্দেশ্য।

আমরা যা কিছু দেখি বা কল্পনা করি সে সবই আকাশে অনুভাবিত হয়। যে আকাশ আমরা দেখতে পাই তার নাম

মহাকাশ। আর যোগী অপরের মনোভাব এবং অতীন্দ্রিয় বস্তু যা কিছু দেখেন তা সবই চিত্তাকাশ। আর যখন আমাদের আত্মা বিষয়শূন্য হয় বা যখন আমাদের আত্মা স্বরূপে প্রকাশিত হয় তখন তার নাম চিদাকাশ।

এখন মনে রাখতে হবে যে কেন্দ্রে বিষয়াভিঘাতজনিত গতি প্রবাহের অবশিষ্ট থাকে বা সংস্কার সমষ্টিগত হ'য়ে সঞ্চিত হয় তাকে মূলাধার বলে। আর ঐ স্থানেই কুণ্ডলীকৃত হ'য়ে কুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজিত থাকেন। কুণ্ডলিনী না জাগলে চৈতন্য দর্শন ও ভগবৎ লাভ হয় না।

চৈতন্য দর্শনের বহু উপায়। কারো বা ভগবৎ প্রেমে, কারো বা সূক্ষ্ম জ্ঞান বিচারে, কারো বা মহাপুরুষের কৃপায় ইনি জাগ্রত হন। এই কুণ্ডলিনী শক্তি অনন্ত সুখ প্রদায়িনী। যোগীরা সদর্পে বলেন, রাজযোগ একমাত্র ধর্ম্ম-বিজ্ঞান।

এখন আমাদের আলোচ্য হ'ল প্রাণায়ামের ক্রিয়াগুলি। শরীরের তিনটি ভাগ—বক্ষ, মস্তক ও গ্রীবাকে সর্ব্বদা ঠিক ঋজুভাবে রেখে ব'সবে। নির্দ্দিষ্ট মাপে নিঃশ্বাস নিয়ে তা নির্দ্দিষ্ট মাপে ত্যাগ কর। দেখবে এতে শরীরের অসামঞ্জস্য দূর হবে। মুখের জড়তা যাবে, মনের অপ্রফুল্লতা কাটবে—গলার কর্কশতা ঘুচে যাবে।

কয়েক মাস উচ্চতর সাধন-প্রণালী নিতে হবে।

সহজ উপায়

প্রথমে ইড়া বা বাঁ-নাক দিয়ে আস্তে আস্তে ফুসফুসকে বায়ু পূর্ণ কর। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে ভাব তুমি যেন স্নায়ু প্রবাহ দিয়ে

মেরুমজ্জার নীচে যে কুণ্ডলিনী শক্তি আছে তাকে খুব উপরে উপরে আঘাত ক'রছ, তারপর কিছুক্ষণ স্নায়ু প্রবাহকে ঐ স্থানে বন্ধ রাখো। ঐ সঙ্গে ভাবো সেই স্নায়বীয় প্রবাহকে শ্বাসের সঙ্গে অপর দিকে অর্থাৎ পিঙ্গলা দিয়ে উপরে টেনে আনছ—তারপর ডান নাক দিয়ে নিশ্বাস ত্যাগ কর। তারপর আগের মত দুই নাক বন্ধ ক'রে মনে কর তুমি স্নায়ু প্রবাহকে নিম্নে প্রেরণ ক'রে সুষুম্নার মূলে আঘাত ক'রছ—তারপর বাঁ নাক দিয়ে নিশ্বাস ত্যাগ কর। এইভাবে সকালে চারবার ও সন্ধ্যায় চারবার।

প্রথমে চার সেকেণ্ড যদি বায়ু পূরণ কর তবে নিশ্বাস বন্ধ রাখতে হবে বা কুম্ভক ক'রবে ষোল সেকেণ্ড, আর ত্যাগ করবার বা রেচক করবার সময় হবে আট সেকেণ্ড—এটী এক রকমের প্রাণায়াম।

আর একটী কথা—এই সময় মাপের সঙ্গে একটী সাঙ্কেতিক সংখ্যাও রাখতে হবে। যেমন ধর নিশ্বাস নেওয়ার সময় ওঁকার জপ করবে চারবার, ধ'রে রাখবার সময় ঐ জপ হবে ষোল বার, ছেড়ে দেবার সময় হবে চার বার। অবশ্য এই প্রাণায়ামের রীতি আছে তিন রকম। শরীর সুস্থ ও মনের সুস্থিরতার জন্য দিনে দু'বার ক'রলেই হবে। কিন্তু চৈতন্য লাভ বা কুণ্ডলিনী জাগরণের জন্য উঠে প'ড়ে লাগতে হবে। যিনি আদ্যাশক্তি তিনিই সকলের দেহে কুণ্ডলিনী রূপে আছেন। ঠিক যেন ঘুমন্ত সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। বহু সাধ্য সাধনায় ইনি জাগ্রত হন। ভক্তিযোগে কুণ্ডলিনী শীঘ্রই জাগ্রত হন (শ্রীঠাকুর)। যোগীদের সুষুম্নার পথ উন্মুক্তই থাকে, সাধন অনুযায়ী কুণ্ডলিনী শক্তি চক্রে চক্রে উপরে উঠতে থাকে। যেমন সর্ব্বনিম্নে মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠান, নাভিতে মণিপুর

হৃদয়ে অনাহত, কণ্ঠে বিশুদ্ধ, ললাটে আজ্ঞা—সর্ব্বশেষে মস্তকে সহস্রার। কুণ্ডলিনী শক্তি সহস্রারে গিয়ে সেখানে যে সচ্চিদানন্দ শিব আছেন তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। সহস্রারে মন এলেই সমাধি। তখন বাহ্যজ্ঞান থাকে না। এ অবস্থায় সাধক তার দেহরক্ষা ক'রতে পারে না। মুখে দুধ ঢেলে দিলেও খাবার শক্তি থাকে না। এভাবে একুশ দিন থাকলে জীবকোটীদের মৃত্যু হয়। যেমন কালাপানিতে জাহাজ গেলে আর ফেরে না। ঈশ্বরকোটী ভক্তি ভক্ত ল'য়ে থাকেন তাই তাঁরা নামতে পারেন (শ্রীঠাকুর)।

যোগীদের মতে মনুষ্য দেহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ওজঃ শক্তি এবং মস্তকেই তা থাকে সঞ্চিত। যার যত এই ওজঃ শক্তি বেশী সে তত বেশী বুদ্ধিমান ও আধ্যাত্মিকবলে বলী।

একটা আশ্চর্য্য ঘটনা—কোন বক্তা সুন্দরভাবে তার ভাব ব্যক্ত ক'রছে কিন্তু লোকের মন ভরছে না। আবার কোন বক্তা সুন্দর ভাব ভাষা দিতে পারছে না, তবু লোকের মন আকৃষ্ট হ'চ্ছে। এর মূল কারণ ওজঃ শক্তি। ওজঃ-শক্তিমান পুরুষ যা করেন তাতেই মহাশক্তির প্রকাশ হয়। মনে রাখতে হবে এক শক্তিই অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হ'চ্ছে। যেমন বহির্জগতে তড়িৎ শক্তি ক্রমশঃ আভ্যন্তরীণ শক্তিতে রূপান্তর লাভ করে। যোগীদের মত মানুষের কামশক্তি দমিত হ'লে তাবেই ওজঃ ধাতুরূপে পরিণত হয়। এই জন্য সর্ব্ব দেশেই ব্রহ্মচর্য্যই শ্রেষ্ঠ পথরূপে গণ্য হয়। কামকে বাড়তে দিলে ধর্ম্ম, চরিত্র ও মানসিক শক্তি সব চ'লে যায়। এইজন্য বিবাহ-ত্যাগী সন্ন্যাসীদের উৎপত্তি। ব্রহ্মচর্য্য-শূন্য হ'য়ে রাজযোগ সাধন বড় বিপদের সৃষ্টি করে। এমন কি শেষে মস্তিষ্কের বিকার দেখা দেয়।

মনকে বাহ্য বিষয় হ'তে সরিয়ে বা মনকে ইন্দ্রিয়গণের অধীনতা হ'তে মুক্ত ক'রে ভিতরে সংযম করার নাম প্রত্যাহার।

উন্মত্ত বাঁদর যদি মাতাল হয় তারপর তাকে আবার বিছে কামড়ায় এবং যন্ত্রণার সময় যদি তার ভিতর ভূত ঢোকে তবে সেই রকম অস্থিরতা ও চঞ্চলতাই মানব মনের তুলনা। মনঃ-সংযম কঠিন হ'লেও পারা যায়। তার প্রণালী—প্রথমে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে মনকে ছেড়ে দাও—তার যথা ইচ্ছা। মন বাঁদর যতই লাফাক, তুমি ধীরভাবে লক্ষ্য ক'রে যাও। খুব ভয়ানক ভয়ানক বিশ্রী চিন্তা হয়ত তোমার মনে আসবে যা কোনদিন চিন্তাও করনি। কিন্তু দেখো কয়েক মাস পরে চিন্তা রাশি ক'মে আস্‌ছে। আরো কয়েক মাস পর ক'মতে ক'মতে মন আমাদের বশে আসবে। এইভাবে মনকে সংযত করা বা ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়গোলক-যুক্ত হ'তে না দেওয়াই প্রত্যাহার।

তবে মনে রাখতে হবে, ধীরভাবে অনেক বছর অভ্যাসের ফলে এতে কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

এর পর ধারণা—মনকে দেহের ভিতরে বা বাহিরের কোন প্রিয় স্থানে ধ'রে রাখাই হ'ল ধারণা। অর্থাৎ মনকে কোন নির্দ্ধারিত স্থানে আবদ্ধ রাখলে তাকে ধারণা বলে। ধারণা আবার অনেক রকম। যেমন বক্ষদেশে একটি পদ্মের চিন্তা কর—তা যেন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। সেইখানে মনটাকে ধারণা কর। না হয়, মস্তকের মধ্যে সহস্র দল কমলের, কিংবা সুষুম্নার ভিতরের চক্রগুলি চিন্তা কর।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ। ৬।১০ গীতা।

প্রতিক্ষণেই এই অভ্যাসের প্রয়োজন। যোগী বেশী কথা ব'লবে না, নির্জ্জনে থাকতে চেষ্টা ক'রবে। দৃঢ়চেতা হ'য়ে নিয়ম অনুযায়ী অভ্যাসে অতি অল্পদিনেই অগ্রগতি প্রকাশ পাবে। মন শান্ত হবে, স্নায়বীয় উত্তেজনাও শান্ত হবে। সব বিষয় ভালভাবে বুঝবার ও দেখবার ক্ষমতা আসবে, মেজাজ ভাল হবে, স্বর সুন্দর হবে, স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। আরো কিছুদিন পরে দূর হতে ঘণ্টার শব্দ শুনতে পাবে এবং ছোট ছোট আলোর রেণু যেন শূন্যে ভাস্‌ছে ও ভাস্‌তে ভাস্‌তে বড় হ'চ্ছে মনে হবে।

যোগীকে প্রথমে ফল, দুধ ও নিরামিষ ভোজী হ'তে হবে। তারপর কোন বিচার নেই। সত্য তত্ত্বকে জানবার জন্য বিশেষ যত্নবান হ'তে হবে।

তবে যিনি একটি ভাবে দৃঢ় থাকতে পারেন তাঁর হৃদয়ে খুব সহজেই সত্য তত্ত্বের উন্মেষ হয়—একটি ভাবের চিন্তা, শয়নে স্বপনে। সর্ব্বদিক—তোমার শরীরের সব ঠাঁই ঐ চিন্তায় পূর্ণ ক'রে দাও, আর আন্-চিন্তা দূর কর—ইহাই প্রত্যাহারে সিদ্ধ হবার উপায়।

যোগী মনকে কোন ভাবেই চঞ্চল হ'তে দেবে না। যাদের সঙ্গে থাকলে মন চঞ্চল হয় তাদের সঙ্গে মিশবে না। দীপশিখা দেখনি, যোগাবস্থা দীপশিখার মত। একটু হাওয়া লাগলেই চঞ্চল হয় (শ্রীঠাকুর)। যাদের উচ্চাশা আছে তাদের ভাল-মন্দ সব সঙ্গই ত্যাগ ক'রতে হবে।

মরা-বাঁচাকে অগ্রাহ্য ক'রে দৃঢ়ভাবে সাধন কর, আপনাকে হীন মনে না ক'রে উদ্যম-সহকারে লেগে যাও—নিশ্চয়ই পরমপদ লাভ হবে।

মহাপুরুষেরা প্রত্যেকেই ছিলেন আমাদের মতই মানুষ। তাঁরা এই যোগের দ্বারাই উচ্চাঙ্গ অবস্থা ও জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ ক'রেছেন। তবে চেষ্টা ক'রলে তুমি ও আমি ঐ অবস্থা লাভ ক'রতে পারি। একজন যখন এ অবস্থা লাভ ক'রেছেন তখন মনে হয় প্রত্যেকেরই তা লাভ করা সম্ভব। শুধু সম্ভব কেন, কালে ঐ অবস্থা লাভ সকলের হবেই হবে। ঐ অবস্থা লাভ করাই হচ্ছে ধর্ম্ম। তবে মনে রাখতে হবে কেবলমাত্র প্রকাশ্য অনুভূতিতেই সঠিক শিক্ষা হয়। সারাজীবন ধ'রে বিচার ক'রলেও সত্য লাভ হবে না। ম্যাপ দেখলে কি সারা দেশ দেখার সাধ মেটে?

ঈশ্বরীয় জ্ঞান শুধু গ্রন্থে আবদ্ধ ক'রলে তাতে ঘোর নাস্তিকতাই হয়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লব্ধ রাজযোগের সাধন ধ'রে ধ'রে এগোতে হবে।

প্রত্যাহারের পর আসে ধ্যান। দেহের মধ্যে বা বাইরে কোন স্থানে মনকে ধ'রে রাখতে বার বার চেষ্টা ক'রলে মনের একটা অবিচ্ছেদ শক্তি—একটি শান্ত গতি লাভ হয়। এই অবস্থার নাম ধ্যান। জীবের এই ধ্যানাবস্থাই হ'ল সর্ব্বোচ্চ অবস্থা। নিরন্তর এই ধ্যানের মাঝে থেকে যিনি স্থায়ীরূপে অন্য সব অবস্থাকে পর্য্যবেক্ষণ ক'রতে পারেন তিনিই যথার্থ ধ্যানী। এক ঈশ্বরের চিন্তা ছাড়া ধ্যানীর অন্য কোন চিন্তা আসবে না। তাঁতে মগ্ন হ'তে হয় (শ্রীঠাকুর)। ইতর প্রাণীর সুখ ইন্দ্রিয় সুখে, মানুষের সুখ বুদ্ধিতে, দেব-মানবের সুখ আধ্যাত্মিক ধ্যানে।

ধ্যানীর কাছে বা যাঁর বাসনা গেছে, যিনি সব বিষয়ে নির্লিপ্ত তাঁর কাছে, প্রকৃতির পরিবর্ত্তন এক মহা সৌন্দর্য্যের বিলাস মাত্র।

মন যখন দৃঢ় ও সংযমিত হ'য়ে সূক্ষ্মতর অনুভব শক্তি লাভ করে তখনই তাকে ধ্যানে যুক্ত করা উচিৎ।

প্রথমে স্থূলবস্তু নিয়ে ধ্যান কর। তবেই সূক্ষ্মতর ধ্যানে অধিকার আসবে। তারপর মন নির্ব্বিকল্পের ধ্যানে সাফল্য লাভ ক'রবে। এমন ধ্যান ক'রবে যে, তাঁতে একেবারে তন্ময় হ'য়ে যাবে। যখন ঠিক ধ্যান হয়, পাখীরা গায়ে বসে কিন্তু সে টের পাবে না। ধ্যান করবে—মনে, বনে, কোণে। ধ্যানের রকম-ভেদ আছে। যোগীর ধ্যান—ভক্তের ধ্যান। জ্ঞানীর—অনন্ত আকাশে যেন আত্মা-পাখী আনন্দে উড়ছে। ভক্তের ধ্যান হৃদ্‌পদ্মে ইষ্টকে এনে বসিয়ে তাঁর চিন্তা-রূপ যাগ-দীপ জ্বেলে রাখবে।

আবার চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয়, কথা কইতে কইতেও ধ্যান হয় (শ্রীঠাকুর)।

শ্রীগীতা মতে—

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ। ৬।১০

যোগী একাকী নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া সংযত চিত্ত, সংযত দেহ, আকাঙ্ক্ষা শূন্য ও অপরিগ্রহ হ'য়ে চিত্তকে সতত সমাধি অভ্যাস ক'রাবেন।

জ্ঞান ও অজ্ঞান এ দু'টি ভূমি হ'তে মন আরও উচ্চ ভূমিতে বিচরণ ক'রতে পারে। সেই অবস্থার নাম সমাধি বা জ্ঞানাতীত ভূমি। এখন প্রশ্ন হ'ল—অজ্ঞানে মানুষের অহং কাজ

করে না, আবার জ্ঞানাতীত অবস্থায়ও অহং-এর কাজ হয় না, তবে এ দু'য়ে ভেদ কোথায় ?

আর জ্ঞানভূমি হ'তে সে নামল ? না, জ্ঞানের অতীত ভূমিতে উঠলো ? কেমন ক'রে বুঝবে ?

মানুষ যখন ঘুমোয় তখন সে জ্ঞানের নিম্নভূমিতে নামে, কারণ সে অজ্ঞাতে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়—শরীর সঞ্চালন করে অথচ তার কাজে তখন অহং থাকে না। তখন সে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন। নিদ্রাভঙ্গের পর, মানুষ আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনি রইল, পরিবর্ত্তন হ'লো না। ঘুমের আগে তার যে বিদ্যা, জ্ঞান সঞ্চিত ছিল তাই রইল, বেশী কিছু বাড়ল না। কিন্তু যদি মানুষ সমাধিস্থ হয়, সমাধির আগে যদি সে মূর্খ ছিল কিংবা অজ্ঞানী ছিল, তবুও সমাধি হ'তে ফিরে সে মহা জ্ঞানী হ'য়ে গেলেন। একটি অবস্থা থেকে মানুষ যেমন ছিল তেমনি রইল, আর একটি অবস্থা থেকে মানুষ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হ'ল। সিদ্ধপুরুষ হ'ল। তার স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন হ'ল। যোগীদের মতে এই অবস্থায় মানুষ বিচার-তর্কের অগম্য জ্ঞানলাভ করে। বিষয়-জ্ঞানের অতীত জ্ঞান বা পরমার্থ জ্ঞান লাভ করে।

কিন্তু এই জ্ঞানাতীত অবস্থায় হঠাৎ এসে প'ড়লে ঘোর বিপদের বা মস্তিষ্ক একেবারে নষ্ট হ'বার সম্ভাবনা আছে।

বৈজ্ঞানিক ধারায় সমাধিবান হ'বার জন্য সমস্ত যোগাঙ্গ বর্ণিত আছে। সেই পথ অনুসারে চ'লতে চ'লতে যখন প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছবে, তখন সব দুঃখ চ'লে যাবে, কর্ম্ম-বীজ দগ্ধ হবে, আত্মা অনন্তকালের জন্য মুক্তি-লাভ করবে।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। (তৈঃ উঃ ৩।১)

যা হ'তে সমুদয় উৎপন্ন হয়েছে, যাতে সমুদয় প্রাণী স্থিতি ক'রছে ও যাতে আবার সকল ফিরে যাবে—এর চেয়ে নিশ্চয় আর কিছু নেই।

আমরা ইচ্ছা করি বা না করি আমাদের সেই আদিতে ফিরে যেতেই হ'বে। ঐ আদি কারণকেই ঈশ্বর বা অনন্তকাল বলে।

এই ঈশ্বরকে যে নামেই ডাকো, গড্, নির্ব্বিশেষ সত্ত্বা, প্রকৃতি কিংবা আর যে কোন নামেই ডাকো না—সেই একই পদার্থ।

সব ধর্ম্মেই এক কথা। মানুষ প্রথমে শুদ্ধ, পূর্ণ। তারপর ক্রমশঃ নীচের দিকে নামে, তারপর আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। বৃত্তাকারে গতি—শুধু আত্মার নয়, প্রত্যেক ভাবেরই এই বৃত্তাকার অবস্থা। বুঝি এই কারণেই নীতিশাস্ত্রে বলে কাকেও ঘৃণা করা ঠিক নয়। তোমার ঐ শক্তি, ঐ ঘৃণাভাব যা তোমা থেকে বেরিয়েছে তা ঘুরতে ঘুরতে কালে তোমার কাছেই ফিরে আসবে। যদি কাউকে ভালবাস, সেই ভালবাসা ঘুরে ঘুরে তোমার কাছেই ফিরে আসবে।

পূর্ব্ব প্রসঙ্গে ফেরা যাক্—ব্রহ্মভাবাপন্ন হ'তে হ'লে প্রত্যেককেই এই বৃত্তাকার অবস্থা মানতে হবে। যেমন—প্রথমে বীজ পুঁতলে, তারপর সেটি প'চে মাটির সঙ্গে মেশে। তারপর আবার তা থেকে গাছ বেড়োয়—যেমন নীহারিকা থেকে চন্দ্র-সূর্য্য উৎপন্ন। আবার তাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করছে—সমস্ত প্রকৃতির নিয়ম এই।

সর্ব্বাতীত অনন্তে পৌঁছবার পথে শরীর যেন একটি বিশ্রামাগার। এই বিশ্রাম যত কম হয় ততই তাড়াতাড়ি লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়।

তাহ'লে এখন কর্ত্তব্য কি ?

শরীর ভেঙ্গে দেওয়া ? না। এটি পরিত্রাণের উপায় নয়।

ক্যাণ্ট বলেন—আমরা যুক্তি-তর্কের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ভেঙ্গে তার অতীত দেশে যেতে পারি না। কিন্তু ভারতবর্ষের সব তত্ত্বেরই প্রথম কথা হচ্ছে—পারে যাওয়া। যোগীরা অতি সাহসের সঙ্গে ঐ রাজ্যের খোঁজ করেন এবং শেষে এমন বস্তু লাভ করেন যা যুক্তির পারে এবং যেখানেই এই পরিদৃশ্যমান অবস্থার কারণ জানা যায়—যা আমাদের জগতের বাহিরে নিয়ে যায়।

(প্রশ্নোপনিষদ্ ৬।৮) "ত্বং হি নঃ পিতা যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি"—তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদের অজ্ঞানের পারে নিয়ে চল।

সুদূর উপনিষদ্ যুগ থেকে চ'লে আসছে এই সাধনা। অনেক শাস্ত্র বা অনেক শাস্ত্রবিৎরা এর আলোচনা ক'রেছেন। যেমন—কূর্ম্মপুরাণের একাদশ অধ্যায়, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্—দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি—সাংখ্য প্রবচন সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়—ব্যাসসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদ এবং আরো অনেক শাস্ত্র।

———

উপসংহার

স্বামিপাদের সমস্ত যোগগুলির পিছনে একটি লীলায়িত কথার অনুরণন আমরা পাই—স্বামিজীর নিজের কথা, শ্রীঠাকুরের ছিল বাইরেটা ভক্তি আর ভিতরে জ্ঞান—আর আমার বাইরে জ্ঞান, ভিতরে ভক্তি। তাঁর সমস্ত যোগগুলির অনুশীলনে আমরা দেখি ভক্তি উপসংহৃত হয় ভগবানের সঙ্গে একাত্মতায়। জ্ঞানীর চরম সাধ্য—আমাদের ক্ষুদ্র অহং-এর বিনাশে। আর এই বিনাশেই আমরা সত্যোপলব্ধি করি এবং এই সত্য হচ্ছেন ভগবান। আত্মার বন্ধন ও মুক্তি প্রসঙ্গে স্বামিপাদ বলেন—আত্মার মুক্তি, বাসনা ত্যাগে। আর ত্যাগেই আমরা ভগবানের সন্নিধি লাভ করি। সার্বজনীন ধর্ম-প্রসঙ্গে বলছেন—আমি সমস্ত ধর্মের সত্যকে গ্রহণ করবো। The watch word is acceptance. সব ধর্ম পথিক-দের সঙ্গে আমি শ্রীভগবানের উপাসনা ক'রব, যে ভাবেই তারা তাঁকে পেতে চায়। অমরত্বের প্রসঙ্গেও স্বামিপাদ ভগবৎ প্রসঙ্গ এনেছেন —এইটি জান যে, তুমিই তিনি। সার্বজনীন ধর্মের আদর্শেও স্বামিপাদ বলেন—যতই সাধক ভগবৎ সন্নিধি লাভ করেন ততই দেখেন যে তার পুরাণো সত্ত্বা হারিয়ে যাচ্ছে—শেষে সে দেখে যে, সে আর ভগবান এক।

রাজযোগে স্বামিপাদ বলেন—চৈতন্য দর্শনের উপায়ের মধ্যে ভগবৎ প্রেম একটি। তিনি আরো বলেন—ঈশ্বরীয় জ্ঞান শুধু শাস্ত্রে নিবদ্ধ রাখলে চ'লবে না।

তাই কর্মযোগে ব'লেছেন—সেই সর্বশক্তিমান বিধাতার চরণে সমুদয় কর্মফল অর্পণ ক'রে কর্ম ক'রে গেলে কর্ম উপাসনা হবে, পূর্ণ মুক্তি মিলবে। এইটিই কর্ম-রহস্য—শ্রীগীতারই প্রতিধ্বনি।

স্বামিপাদের এই সব লেখার মধ্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের গূঢ় রহস্যের ইঙ্গিত রয়েছে—যেমন জগতের তড়িৎশক্তি আভ্যন্তরিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আমরা ডাঃ কুরীর মতবাদ, Matter and energy are convertible, এই তত্ত্বের ব্যাপক ইঙ্গিত এখানে পাই। রাজযোগে বিজ্ঞানের সঙ্গে যোগের অনেক স্থলে তাত্ত্বিক তুলনায় আমরা যোগের নূতন আলো পাই। যেমন যোগীর মন Battery বা বিদ্যুৎ আধারের মত হয়। এতে মনের বিশেষ amplifying ও detecting প্রভৃতি ক্ষমতা লাভ হয়। Television, Radio wave theory দিয়ে দূর-দর্শন, দূর-শ্রবণ ইত্যাদির ব্যাখ্যা এর প্রমাণ। Psychic healings প্রভৃতি মতকেও যুক্তিবাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন। যোগের বহু তত্ত্ব তিনি এমনি ক'রে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দেখিয়েছেন।

দর্শনের নূতনত্বে স্বামিপাদের মতে নৈয়ায়িক চিন্তার উপরে র'য়েছে যে উচ্চ অবস্থা, তাই অধ্যাত্মজীবনের লক্ষ্য—যে যুগে পাশ্চাত্যের কাণ্ট প্রভৃতির মতে rational thought বা যুক্তি-সহ চিন্তার উপরের স্তরে আমরা পৌঁছাতে পারি না। বর্ত্তমানে স্বামিপাদের মতই, Transcendentalism ও Intuitionalism, সর্বজনসিদ্ধ।

এদেশের ওদেশের দর্শন ও নবীন বিজ্ঞানের তত্ত্ব সমন্বিত ব্যাখ্যা ক'রে স্বামিপাদ ধর্মকে এক নূতন দৃঢ় ভিত্তিতে বর্ত্তমানের উপযুক্ত ক'রে প্রতিষ্ঠিত ক'রলেন বলেই তাঁকে এ যুগের অংশাবতার বলেই আমাদের মনে হয়।